প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬, মে ১৯৫৯

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম। প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের ন্যায় লৌকিক প্রেমও রবীন্দ্রসাহিত্য-ভাণ্ডারের অনুপম ঐশ্বর্য। বলাই বাহুল্য, এই গ্রন্থের পরিচ্ছিন্ন পরিসরে বিচিত্র ও বিপুল রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট দিক নিয়েই আলোচনা করেছি এবং পটভূমির অনিবার্য দাবিতেই রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলাসাহিত্যে প্রেম ও তার স্বীকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট থেকে যে-সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের নিকট থেকেই আমি এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা পেয়েছিলাম। প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগী হ'য়ে উৎসাহ দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত অমল হোম ও শ্রীযুক্ত তপেশ গঙ্গোপাধ্যায়। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব।

২৫ বৈশাখ, ১৩৬৬ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

মাতৃদেবী ও পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

সূচী

১ ॥ বাংলাসাহিত্যে প্রেম

. . . .

প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার সংঘাতে মানুষের সমাজজীবনে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের বিক্ষুব্ধ ভাবতরঙ্গের ইতিহাস সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়, কারণ সাহিত্য সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। বস্তুত প্রত্যেক কালের ধ্যানধারণার মূল কেবলমাত্র সে-যুগের স্বধর্মের মধ্যেই নিহিত নয়। অতীত তাকে সৃষ্টি করেছে, সে ভাবীকালকে সৃষ্টি ক'রে যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিশিষ্ট যুগ অতীতের সংস্কার বহন করে এবং ভাবীকালের দিশা জাগিয়ে দেয়। সাহিত্যেও এই পারম্পর্য— অতীতের সংস্কার ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত— লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই প্রত্যেক যুগের সাহিত্যকে তার পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়।

যুগোত্তর প্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও রবীন্দ্রব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটেছিল বিশেষ একটি যুগে বিশেষ একটি দেশে— সুতরাং সে-দেশের সে-যুগপ্রবাহের বিভিন্ন ভাবতরঙ্গের বিচিত্র স্বাক্ষর রবীন্দ্রসাহিত্যেও অনিবার্য। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের যে-লীলা ও বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে তা অভিনব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল; তবুও লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যে ও

সমাজে প্রেম-সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংঘাতে যে-চেতনা জেগেছিল, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রবীন্দ্র-সাহিত্য। কাজেই রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের আলোচনার সূচনাতে রবীন্দ্রপূর্ব প্রেমসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

নারী এবং পুরুষের জীবনের পূর্ণতা ঘটে প্রেমে। মানুষের জীবনে তৃপ্তি নেই, আছে অনন্ত তৃষ্ণা; আর এইজন্যই তার অস্থিরচিত্ততা ও সন্ধানব্যাকুলতার অবধি নেই। নানাদিকে তাই মানুষ ছুটে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায় আপন সার্থকতা অসংখ্য বৈচিত্র্যে। কখনো-কখনো কোনো একটা বিশেষ মত বা পথ কারও জীবনের ব্রত হ'য়ে ওঠে এবং তখন দেখা যায় হয়তো লৌকিক প্রেমের অবলম্বন তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে পড়েছে। এই কারণেই হয়তো সাধক বলতে পারেন এ-সংসার মায়া, একে ত্যাগ করতে পারলেই মানবজীবনে চরম মুক্তি, পরম সুখ। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের কাছে এই মায়াটাই বড়ো হ'য়ে উঠেছে। এই মায়া-মোহের বিচিত্র বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজালে ঢাকা জীবনে আমরা মুগ্ধ।

সাধারণ মানুষ জ্ঞান বা সাধনমার্গের এমন পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে নি যাতে এ-জীবনের চাওয়া-পাওয়া তার কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে। এই কারণেই সাধারণ মানুষ তার সাধারণ ভাব এবং বোধ নিয়ে কোনো একটি চিন্তার উত্তুঙ্গশিখরে নিজেকে স্থাপিত করতে না পেরে আপনাকে ব্যাপ্ত ক'রে দেয় জ্ঞান ভক্তি কর্ম প্রেম ইত্যাদির বিবিধ প্রেরণায় ও অনুভবে। এইখানেই আমাদের লাভ। প্রেম না থাকলে সাহিত্য হ'ত না। তাই রাজপুত্র কখনো ঘুমন্ত রাজকন্যাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয়, কখনো বা রাজকন্যা রাজপুত্রকে। প্রেমই এই সোনার কাঠি। বস্তুত, সাধারণ মানুষ হ'লেও প্রেমিক-প্রেমিকা সংসারের কঠিন

বন্ধুর পথে, জীর্ণ দৈনন্দিনতার মধ্যেও অন্তর-ঐশ্বর্যে রাজপুত্র-রাজকন্যা আখ্যা পাবারই যোগ্য। এই জন্যই বোধ হয় প্রাচীন কবিরা মহৎ ও ঐশ্বর্যবান পুরুষ-নারীর প্রেমের কাহিনী রচনা করতেন।

প্রেমের মোহিনী শক্তির বলে দুটি নরনারীর জীবন এবং তাদের চোখে বিশ্বজগতের সব-কিছু ভাবপুলকে ও অনির্বচনীয় রসমাধুর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তখন এই ভাব দুটি বিশিষ্ট লৌকিক জীবনের সীমানা অতিক্রম ক'রে সংসারের প্রতিদিনের ব্যবহারিকতা ও ধূলিমলিনতার ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে যায়। কবি যখন অন্তরের এই অনুভবকে বাণীমূর্তি দেন তখন তা দুটি নিবিড় হৃদয়ের ব্যাকুলতা ছাপিয়ে সার্বভৌম হৃদয়গাথায় রূপান্তরিত হয়।

এমনকি আধ্যাত্মিক ভাবুকেরাও প্রেমের রহস্যময় স্বরূপ সন্ধানে ভগবানের অনন্তলীলার সম্বন্ধ আরোপ করেন। এই বিস্ময়কর ভাবের স্বাধীনতা আচারনিষ্ঠ হিন্দুর সমাজেও সগৌরবে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে আমাদের লাভ হয়েছে অপূর্ব বৈষ্ণবকাব্য। ঈশ্বরকেও আমরা প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছি, দূরে সরিয়ে রাখি নি। বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেছেন, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন নিজেকে আস্বাদন করবার জন্য। তাই মানুষের জীবনের বিচিত্র অনুভবের মধ্যে তাঁরই লীলা অব্যাহত।

মঙ্গলকাব্যে

বাংলাসাহিত্যে প্রেমের আলোচনায় প্রথমে মঙ্গলকাব্যের কথাই ধরা যাক। মধ্যযুগে বাংলার সমাজজীবন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সে-যুগের বাঙালী সনাতন বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে চিরাচরিত প্রথাকেই নির্বিচারে মেনে নিয়েছিল।

সাধারণত সে-যুগে সৃষ্ট সাহিত্যেও সমাজ-অনুশাসিত জীবনধারার কোনো ব্যতিক্রমের চিত্র স্থান পাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-যুগের গ্রাম্য কবিগণ সাধারণ সমাজ-প্রচলিত গার্হস্থ্য-দাম্পত্য প্রেমের তৎকালীন বিশেষ আদর্শটিরই জয়গান ক'রে গিয়েছেন।

তখনকার সাধারণ মানুষের জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ, কাজেই তাদের জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে আজকের দিনের মতো জটিলতা বা বৈচিত্র্য দেখা দেয় নি ; যদিবা বাস্তবজীবনে কোনো সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে তবু সাহিত্যে তা উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নি। কারণ সমাজবিধিকেই তখনকার যুগের মানুষ নির্বিচারে মেনে নিয়েছিল, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি বা এ-বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা জাগায় নি।

বিপুল মঙ্গলকাব্যে বোধ করি এক বেহুলার প্রেম ছাড়া আর কোনো প্রেমিকার প্রেম নিত্যনৈমিত্তিক সংসারসীমা ছাড়িয়ে একটি মহৎ ভাবভূমিকে স্পর্শ করতে পারে নি। বেহুলার প্রেমে এক-দিকে করুণ কোমলতা, অপরদিকে নির্ভীক তেজস্বিতা। প্রেমের এই নিষ্ঠা ও বীর্যবত্তার জোরেই সে মৃত্যুর পার থেকেও স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নৃত্যগীতে স্বর্গসভার মনোহরণ করতেও পশ্চাৎপদ হয় নি। বেহুলা-চরিত্রে কবিকল্পনার প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বেহুলাও এমনিভাবে চিত্রিত যে, জীবনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবনিকাশের কোনো অভিযোগ নেই তার সমাজের কাছে, কেননা তার জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে দৈবের বিড়ম্বনায়।

মঙ্গলকাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার প্রেমেরও নিষ্ঠা, গভীরতা প্রকাশ করা হয়েছে। সহস্র দুঃখ ও অসহ্য দারিদ্র্যের মধ্যেও ফুল্লরার স্বামিপ্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। ভগবতী যখন পরমাসুন্দরী যুবতীমূর্তি ধারণ করলেন তখন ফুল্লরা তার দুঃখের যে-বর্ণনা দিয়েছে তাতে

এই নারীর সহনশীলতা ও নীরব পতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর সংসারের এই বিড়ম্বনা দূর ক'রে নিজেদের জীবন-যাত্রায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার সুকঠিন অভিপ্রায়ে সে যখন ধনুর্বাণ নিতে এগিয়ে এল, তখন এ-কাজে ঈর্ষা বা রূঢ়তা যতই প্রকাশ পাক, এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে স্বামীর মোহ-মুক্তির জন্য যোগ্য সহধর্মিণীরূপেই তার পরিচয় দিয়েছে ফুল্লরা। খুল্লনাও নানা দুঃখদুর্দশা ভোগ করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল।

হরগৌরী, রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনীগুলিতে তিনটি সর্বভারতীয় প্রেমাদর্শ পূর্বাপর প্রচলিত রয়েছে আমাদের দেশে। হরগৌরীর প্রেম গ্রাম্যবাংলার গার্হস্থ্য প্রেমের কাহিনী। কিন্তু রামসীতার দাম্পত্য প্রেম ত্যাগ ভক্তি ও গাম্ভীর্যে অন্যতর আদর্শ প্রকাশ করে। এই দাম্পত্য-গার্হস্থ্য-প্রেমকাহিনী ও দাম্পত্য-বন্ধনের অতিরিক্ত প্রেম— দুটি আদর্শই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ছিল। যেমন হরগৌরী ও রামসীতার কাহিনী দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ, তেমনি সামাজিক কর্তব্যবন্ধনাতিরিক্ত প্রেমের আদর্শ রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী। গৃহবন্ধনাতিরিক্ত বাঙালীমানসের এই প্রেমকল্পনা আধ্যাত্মিক অর্থে সার্থকতা পেয়েছে।

রামসীতা, হরগৌরী, নলদময়ন্তী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রেম-কাহিনী সর্বভারতীয়। কিন্তু বিভিন্ন বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই কাহিনীগুলি অবলম্বিত হ'লেও সেগুলিতে বিশেষভাবে বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে রাধা-প্রেমের উৎকর্ষ সত্ত্বেও কৃষ্ণের দিক থেকে প্রেম পৌরুষদীপ্ত হয় নি। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের পূর্বে বাংলা প্রেমসাহিত্যের এ একটা মস্ত বড়ো অভাব। পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমে এই পৌরুষের অপরাজেয় মহত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

মঙ্গলকাব্যে নায়িকাদের মধ্য দিয়ে বিবাহিত জীবনের প্রেমের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রকাশিত। সীতা-সাবিত্রীর আদর্শই মঙ্গলকাব্যের প্রেমিকাদের আদর্শ। এ-যুগে লৌকিক জীবনে গার্হস্থ্য প্রেমকেই একান্ত এবং অনন্য ব'লে ধরা হয়েছে; বলা বাহুল্য, পুরুষের একাধিক বিবাহ স্বীকৃত এবং বহুলপ্রচলিত ছিল। কিন্তু সপত্নীভারগ্রস্তা নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধের জটিলতার প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাত নেই, যদিও সপত্নীকলহের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্তর্বেদনা ও ব্যবহারিক কলহ এ দুটি বিষয় যে ভিন্নার্থক সে-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই এবং এই কারণেই সমাজনির্দিষ্ট দাম্পত্যজীবনে যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও প্রেমের জটিলতা ও বেদনাময় অভিনব রূপ ফুটে উঠতে পারে নি। এই মঙ্গলকাহিনীগুলির পরেই উল্লেখ করতে হয় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের। বিদ্যাসুন্দরে বিবাহিত প্রেমকাহিনী নয়, পূর্বরাগের কাহিনীই সবিস্তার বর্ণনা লাভ করেছে। প্রথমেই বলতে হয় সমাজ-ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বাঁধা ছকের আবরণ ছিন্ন ক'রে ভারতচন্দ্র রূপজ ও কামজ আকর্ষণের সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন।

কেবলমাত্র বিদ্যাসুন্দরের রতিবিলাসের চিত্র আঁকাই হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল না— তাঁর উদ্দেশ্য আরও গভীর। জৈবক্ষুধার নগ্ন প্রকাশের দ্বারা সে-যুগের সমাজ-অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র আঁকাই সম্ভবত তাঁর মনোভাবে সক্রিয় ছিল। সে-সমাজে নরনারীর স্বাধীন মনোনয়ন এবং প্রেমের সহজ আদানপ্রদানের অভাবে বিকার অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। তার প্রতিই কবির সজ্ঞান ব্যঙ্গ। চির-প্রচলিত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম করতে গিয়ে বৈষ্ণবকবির মতো সমাজ-মানসকে বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা মানসিকতার রাজ্যে স্থাপন করতে পারেন নি, বোধ হয় এটা তাঁর অভিপ্রায়ও ছিল না।

যে-সমাজ চারিদিকে কঠিন নীতিনিষেধের কণ্টক-আবেষ্টনী দিয়ে বাহ্যিক শুচিতা রক্ষার চেষ্টা করেছিল, সেই সমাজেরই ব্যর্থ প্রয়াস, সেই সমাজেরই আভ্যন্তরীণ কলঙ্ককালিমা ভারতচন্দ্র বিদ্রূপের কশাঘাতে উদ্ঘাটন করেছেন। সজ্ঞান প্রয়াস কবির যা-ই থাক, শিল্পনৈপুণ্য ও অনবদ্য ছন্দোসমৃদ্ধি সত্ত্বেও ভোগতান্ত্রিকতার আতিশয্যে বিদ্যাসুন্দরকাব্যে প্রেম অনুভূতির গভীরতায় পৌঁছাতে পারে নি। এ হ'ল প্রেমের বহিরঙ্গ সাধনা— আত্মিক সমুন্নতি সাযুজ্য নয় এবং সেই কারণেই অনাবিল রস-স্বাদ এতে নেই।

সমগ্র বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই জীবন-বোধের, রসবোধের এই সংকীর্ণতা বড়ো বেশি প্রকট হ'য়ে ওঠে। সে-যুগের বাঙালীর জীবনচিত্রে ও প্রেমানুভূতিতেও দৈন্য সুস্পষ্ট। সে-সমাজে স্বাধীন মনোনয়ন অস্বীকৃত, শিক্ষার বিস্তার নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতাও জাগে নি। পুরুষেরই জীবনের প্রসার যেখানে সংকীর্ণ, সেখানে সমগ্র-জীবনরসে-পরিপূর্ণা নারীকেই বা পাব কি ক'রে? তা ছাড়া যাদের প্রেমের কাহিনী কাব্যে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যেও প্রেমের পূর্ণপরিণত রূপ সার্থকভাবে ফুটে ওঠা সম্ভব হয় নি। এর কারণ অপরিসর সামাজিক পরিবেশ এবং অপরিণত বয়সে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ। ফুল্লরা, খুল্লনা, বেহুলা সকলেই বালিকাবধূ। সপত্নীকলহ, পতিনিন্দা প্রভৃতি যে-সব চিত্র মঙ্গলকাব্যে স্থান পেয়েছে প্রেমের মাহাত্ম্য তাতে প্রকাশ পায় নি, মর্যাদাও বাড়ে নি; বরং প্রকাশ পেয়েছে ঈর্ষাদিগ্ধ ক্ষুদ্রচিত্ততার কাহিনী। পুরুষের দিক থেকেও অনুরূপ দৈন্য আমাদের নিরাশ করেছে। হৃদয় এবং মননের সমন্বয়ের অভাবে এ-প্রেমের পূর্ণতা ঘটে নি এবং অনুরূপ কারণেই তার লীলাবৈচিত্র্যও অনুপস্থিত। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের দাম্পত্য প্রেমে এইটিই মহৎ অভাব।

এক বেহুলার হৃদয়াবেগের মাধুর্য ছাড়া মঙ্গলকাব্যে নারীমনের সৌন্দর্যই বা তেমন ক'রে কোথায় ফুটে উঠেছে ?

কিন্তু এই সব অভাব সত্ত্বেও একটা জিনিস সেখানে আছে, তা হচ্ছে নারীর অবিচল বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা। কোনো কাব্যকে বিচার করতে হ'লে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে করাই উচিত। আজকের দৃষ্টিতে হয়তো আমরা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত প্রেমে দীনতা, অপরিপূর্ণতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করব— তার রং বড়ো ফিকে ব'লে আমাদের মনে হবে, কিন্তু এ-কথাও সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, দুঃখস্বীকার ও আত্মোৎসর্গ যদি প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হয় তবে তার প্রকাশ মঙ্গলকাব্যে হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দাম্পত্য-সম্বন্ধের মধ্যে যে দুরূহ বিঘ্ন ও দারিদ্র্য ছিল, তা পরাভূত হয়েছে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে। গৃহের সংকীর্ণ পরিসরেই মঙ্গলকাব্যের বনিতাগণ স্বামীর সুখে-দুঃখে সমান অংশভাগিনী হয়েছে। প্রীতি, ভক্তি, ক্ষমা ও ধৈর্যে মঙ্গলকাব্যের গার্হস্থ্য-দাম্পত্য প্রেম সমুজ্জ্বল।

বৈষ্ণবকাব্যে

বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের উৎসমুখেই প্রেমে সমস্যাসংকুলতা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। সামাজিক জীবনে বাঁধাধরা নিয়মকে অতিক্রম করতে না পারলেও সে-যুগের বাঙালীর মন তাকে মেনে নিতে রাজী হয় নি ; তাই ভাবের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার রাশ আল্‌গা ক'রে দিয়েছিল। সেই কারণেই সম্ভব হয়েছে বৈষ্ণবকাব্যে নারীর চিরন্তন প্রেয়সী মূর্তির কল্পনা করা এবং বিবাহবন্ধনে, গার্হস্থ্যজীবনের পরিমিত সীমায় সেই প্রেমিকাকে খণ্ডিত ক'রে না দেখা। বৈষ্ণবসাহিত্যে পরকীয়া প্রেম সমস্ত মাধুর্য ও

বৈচিত্র্য নিয়ে স্থান পেয়েছে। কিন্তু পরকীয়া কেন? এ-প্রশ্ন সহজেই মনে জাগে।

সমাজনির্দিষ্ট স্বকীয়াতেই যে সত্তার সর্বব্যাপ্তি ঘটবে এমন নিশ্চয়তা না থাকতেও পারে। অনেক সময়েই থাকে না। প্রেম সৃষ্টি করে, সত্তার ব্যাপ্তি ঘটায়। সমাজনির্দিষ্ট স্বকীয়া-সংসর্গে প্রেমের বৈচিত্র্য বিকাশের সুযোগ স্বল্প; অথচ সে-যুগে বাঙালী-জীবনের পরিধির এমন বিস্তার ছিল না যাতে অন্যরূপ কল্পনা সম্ভব। তাই পরকীয়া তত্ত্বকে কাব্যে রসে রূপে নতুন মূর্তি দিয়েছেন বৈষ্ণবকবি। সামাজিক ব্যবধানের দুঃখখচিত বিস্ময়ময় প্রেমকল্পনা কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। বৈষ্ণবকবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সংসারের সঙ্গে যুক্ত করেন নি। সে রোমান্টিক আদর্শ যে বাস্তবে ধরা দেবে না, এটাই তাঁরা প্রথম থেকে ধ'রে নিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশিতে ডেকেছেন আর মিলন হয়েছে যমুনাপুলিনে অথবা কুঞ্জবনে। বৈষ্ণবকাব্যের এই মনোমুগ্ধকর গোপনীয়তা ও শরম-শঙ্কায় এক অভিনব স্বাদুতা নেই কি?

সম্ভবত বৈষ্ণবকাব্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরবর্তীকালে। মহাপ্রভুর প্রভাবেই বৈষ্ণবপ্রেমের স্বরূপবৈলক্ষণ্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব-সাহিত্যের নায়িকা শ্রীরাধা তাঁর মানবীয় সত্তা ত্যাগ করতে পারেন নি। মানবিক সত্তা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমন্বিত হয়েছে ব'লেই বৈষ্ণবপ্রেমে সরু মোটা দুটি তারই জড়িয়ে আছে। এই কারণেই বৈষ্ণবপ্রেমের দ্বৈতসত্তা। শ্রীরাধার প্রেম 'কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যে' সার্থক। কিন্তু এই বিশুদ্ধ কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যেই মানবিক মূল্য নিহিত।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন ক'রে যে-কাব্য গ'ড়ে উঠেছে তার ভাবগত উপাদান হচ্ছে পার্থিব প্রেম। রাধাকৃষ্ণ-

প্রেমের বিভিন্ন ভাব কি ক'রে পরবর্তী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তা লক্ষ্য করলেই পার্থিব জগতের সাধারণ মানবীর সঙ্গে শ্রীরাধার স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করতে হবে। বৈষ্ণবকবিগণ ভগবৎপ্রেমের ব্যাখ্যায় মানুষী প্রেমকেই আশ্রয় করেছেন এবং সাধারণ সমাজপ্রচলিত বিবাহিত প্রেমকে অবলম্বন না ক'রে সর্বসংস্কার-মুক্ত, লজ্জা-ভয়-বাধা-অতিক্রমকারী পরকীয়া প্রেমকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কিন্তু এই পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, বোধ করি, সেটি তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই এড়িয়ে গিয়েছেন, নচেৎ রাধাপ্রেমে নানা জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারত। কিন্তু পরবর্তী প্রেমসাহিত্যে এই পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপেক্ষিত হয় নি, বরং সামাজিক অসংগতি ও সমস্যার কথা সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এই অনিবার্য সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোনো দিনই সম্ভব নয়। আধুনিক সাহিত্যে জীবনের জটিলতা যেভাবে রূপ নিয়েছে তাকে আর শুধু পরকীয়াবাদ ব'লে আখ্যা দেওয়া চলে না।

যা-ই হোক, সমাজ-অনুশাসনে ব্যক্তিসত্তা অনেক সময় পীড়িত হয়, বিড়ম্বিত হয়— এ-চেতনা বৈষ্ণবকাব্যেও সুস্পষ্ট। রাধা যখন বলেন—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।[১]

বাঁশি যখনই উন্মনা ক'রে তুলল কুলবধূকে, তখনই বুঝতে হবে অনেক দুঃখ অপেক্ষা ক'রে আছে তার জন্য। অথচ বৈষ্ণবকাব্যে পরকীয়া প্রেমের বাস্তব দিকটি উপেক্ষিত ব'লেই সে-কাব্যের

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রেমিকা সমাজবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সেই বিবাহিত রমণীর হৃদয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের দুঃসহ সংঘাত বিক্ষুব্ধ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি, যা হয়েছে আধুনিক সাহিত্যে। বৈষ্ণব প্রেমিকা বিদ্রোহিনী বটে, সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে অভিসারযাত্রাও করেছেন, কিন্তু স্বভাবে তিনি নির্বিরোধ। তিনি নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন ক'রে দিতে চান দয়িতের সত্তায়। কিন্তু আজকের প্রেমিকা দুঃখকে স্বীকার ক'রেও আমিত্বকে বিসর্জন না দিয়ে প্রেমের পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করতে চায় এবং আত্মসচেতন ব'লেই তার মনে প্রেমের সঙ্গে সংস্কার ও সমাজ-চৈতন্যের দ্বন্দ্ব বাধে। তাই সে-দিনের যে-প্রেমকাব্য ভাবনিবিড়তায় তন্ময় হ'য়ে উঠেছিল, আজ তা ধীরে-ধীরে নানা জটিল গ্রন্থি ও প্রশ্নসংকুল পরিধি-বিস্তারের পথে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য বৈষ্ণবসাহিত্যের পার্থক্যের অন্যতম প্রধান কারণ যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-প্রক্ষেপ, সে-কথা বলাই বাহুল্য। নচেৎ সমস্যাটা অন্যদিক থেকেও উত্থাপন করা যেত। দুটি পুরুষের ভালোবাসার টানা-পোড়েন নারীর অন্তরজীবনে কি আন্দোলন সৃষ্টি করে তার ইতিহাস স্থান পেয়েছে পরবর্তী-কালের সাহিত্যে। পূর্বেই বলেছি বৈষ্ণবকবিরা এদিকটা এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেমের রীতি অনুসরণ করা এবং পরিশেষে তা তত্ত্বরূপ ধারণ করেছে।

কিন্তু তত্ত্বকথা যা-ই থাক, সাধারণ মানুষ সাধারণ বোধ নিয়েই এ-কাব্য আস্বাদনে আনন্দ পেয়েছে এবং পাবে। নরনারীর প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি আরোপিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণপ্রেমে। কবিরা কুণ্ঠাহীনভাবে নিজেদের হৃদয়কে মেলে ধরেছেন কাব্যে। আর যে-অনুভূতি মানুষের অনায়ত্ত তার প্রকাশও সম্ভব নয়। সুতরাং কাব্যের দিক থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রেমকে বিচার করাই শ্রেয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বিখ্যাত শ্লোকে বৈষ্ণবপ্রেমের ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

সহজ ভাবে এর অর্থ গ্রহণ করা যাক। কৃষ্ণে প্রীতিই প্রেম, আত্মপ্রীতি কাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা শুধুমাত্র আত্মতুষ্টিকে যথার্থ প্রেম আখ্যা দিই না। সাধারণ মানুষের প্রেমও সার্থকতা খোঁজে প্রিয়ের সন্তুষ্টির মধ্যে, আপনাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে। এই লৌকিক প্রেমে, মানুষের এই হৃদয়বৃত্তিটিতে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে বেদনা, কেবলমাত্র একে দেহ-কামনায় আবদ্ধ দুর্বার আকর্ষণ মনে করলে অনেকখানি ভুল করা হবে—যদিও বৈষ্ণবদর্শনমতে মানুষের প্রেম যত উচ্চস্তরেরই হোক, তা কামগন্ধহীন হ'তে পারে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে কখনোই যে সে-ব্যতিক্রম সম্ভব নয় তা মানতেও মন অস্বীকার করে। তা ছাড়া, এই অতি সংগত কথাটা মেনে নিয়েও স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, বৈষ্ণবকবি মানুষী প্রেমের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁকে অবলম্বন করতে হয়েছে এই প্রেমের আর্তি, এবং দেহগত রূপকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। যদি পারতেন তা হ'লে কৃষ্ণ-প্রেয়সী শ্রীরাধা সৃষ্টি সম্ভব হ'ত না, আর রাধাবিহীন বৈষ্ণবকাব্য কিছুতেই এতকাল ধ'রে আমাদের মনোহরণ করতে পারত না।

সন্দেহ-শঙ্কা-সংকুল, বিরহ-ব্যথা-বিধুর, প্রিয়সমাগম-উৎসুক যে বৈষ্ণবীয় প্রেম, সেই প্রেমই মর্ত্যের নর ও নারীর। প্রেম মানুষের এমন একটা অনুভূতি যার উপলব্ধিতে ক্ষোভ ও অপূর্ণতার দৈন্য দূর হয়। ভবভূতি বলেছেন—

অদ্বৈতং সুখ দুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নাহার্য্যেরসঃ।

কালে না যরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষ্যং কথমপ্যেকম্ হিতং প্রাপ্যতে ॥[১]

কালিদাসের উমা বলেছেন—

সমাত্র ভাবৈক রসং মনস্থিতম্।

আর, প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রকার বলেছেন—

সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥[২]

প্রেমের স্বভাবই এই। মহাজনেরা মানবীয় প্রেমকেই এমন একটা উঁচু পর্দায় বেঁধেছেন, যেখানে ধরা রয়েছে মানসিক উপলব্ধির নির্যাসটুকু। মানুষী প্রেমেরই অভিনব স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণবকাব্যে, যদিও অনেক কবির হাতে সে-নিয়ম যে ভঙ্গ হয় নি তা নয়— কিন্তু সেহ বাহ্য।

বৈষ্ণবকাব্যে মানুষই পেয়েছে তার মহত্তম মর্যাদা। প্রেম এমনই এক উপলব্ধি যা মানুষকে তার রিরংসাবৃত্তি থেকে অনেক অনেক দূরে উচ্চমার্গে নিয়ে যায়। সেই মানুষী সত্তার ভাগবতী রূপকেই মূর্ত করেছে বৈষ্ণবকাব্য, আর বলতে চেয়েছে যে মানুষের আন্তর-জীবন সহজ, সরল— সেখানে কোনো জটিলতা নেই যদি সে ঐ কামবৃত্তিকে অতিক্রম করতে পারে।

কিন্তু সাধারণত দেখি যে, এ দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ অব্যাহতি পায় না। তাই ব'লে কোনো দেহধারী মানুষই যে এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে পারে না এমন কথাও বলা ঠিক নয়। পারে নিশ্চয়, না হ'লে তার কল্পনা করাই বা সম্ভব হ'ল কি ক'রে? বৈষ্ণবকাব্যে সংসারের সঙ্গে সংগতি রক্ষার প্রয়াস বড়ো হ'য়ে

১ প্রথম অঙ্ক, উত্তররামচরিত
২ উজ্জ্বলনীলমণি, রূপগোস্বামী

ওঠে নি ; সেখানে দ্বন্দ্বরহিত নারীর প্রিয়াসত্তা ও পুরুষচিত্তের চিরপ্রিয় পিপাসাটি হৃদয়তাপোৎসারিত ভাবমূর্তি পেয়েছে।

মানুষের প্রেমে যখন এই উঁচুগ্রামে সুর বাজে তখন তা মর্ত্য-জীবনের মধ্যে, খণ্ড সীমার মধ্যে স্বর্গীয় দ্যুতি আনে। মর্ত্যের বাণী বিরহ-বেদনাতেই অমর্ত্য হ'য়ে ওঠে। চণ্ডীদাস বলেছেন—

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।[১]

এই দুঃখকে বড়ো ক'রে দেখার, বড়ো ক'রে পাবার সাধনাতেই প্রেমের যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়। বৈষ্ণবপ্রেমের এই বেদনার মূলে মানবিক ব্যথার প্রেরণা ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। আর সেই কারণেই এই অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥[২]

দেহই আত্মার আধার। আত্মিক মিলনের, মানস মিলনের সঙ্গে দেহকেও স্বীকার করতে হয়। তাই এই প্রিয়মিলনোৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা। বিদেহী প্রেম এ নয়, এ গীতমূর্ছনায় বিরহী হৃদয়ের ক্রন্দন। এ হ'ল প্রাণের তাগিদে লেখা, তাই ভাবের বেদনা এমন নিবিড়, এমন নিরলংকার তার ভাষা। বৈষ্ণবকাব্যের শ্রীকৃষ্ণ সগুণ ও স্বরূপ বিশেষ একটি মানবায়িত মূর্তি, তিনি এখানে নির্বিশেষ নন ; শ্রীরাধাও শুধু প্রতীক নন, বিশেষ মানবী।

প্রেম সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা নয়, জীবনের অপ্রকম্প ব্রত— সুখে, দুঃখে, সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিতে তার প্রকাশ। রাধাপ্রেমের লক্ষ্য এক, অদ্বিতীয়, অভ্রান্ত। এই বিশেষ নায়ক-নায়িকার অনুরাগের মধ্য দিয়ে চিরকালীন মানব-প্রেমের অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। সেই প্রেমিকের প্রেমকে উদ্দেশ ক'রে রাধা যখন বলেন—

১ পদামৃতমাধুরী
২ ঐ

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।[১]

তখন এই অতৃপ্তি, এই অত্যুক্তিতে মানবের চিরন্তন অতৃপ্ত বেদনা ধ্বনিত হ'ল। শ্রীরাধার লক্ষ্য এক কিন্তু বেদনা অসীম। মানুষের বেদনা অসীম কিন্তু লক্ষ্য সর্বত্র একমুখী না-ও হ'তে পারে। মানুষের মনে অনন্ত তৃষ্ণা, অনন্ত অশান্ত কামনা— তাই তার প্রেম জটিল।

বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রেম নিত্যধর্মরূপেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই কারণেই জাত কুল ইত্যাদি আচারধর্মের বাধাবিপত্তি অনুরাগিণী রাধা অতিক্রম করেছেন, অবশ্য অনেক দুঃখকষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। কারণ দুঃখের তপস্যা ব্যতীত প্রেম সার্থক হ'তে পারে না কখনোই। বৈষ্ণবের শ্রীরাধা

বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।[২]

এই দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে ত্যাগ আসে, উৎসর্গের ভাব আসে। ত্যাগ এবং তপস্যার আদর্শই মহৎ প্রেমের আদর্শ। বৈষ্ণব-প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগ— এমনকি আপন সত্তা, ব্যক্তিত্বের স্বরূপ পর্যন্ত। এই নিজস্ব সত্তাকে বিলীন ক'রে দেওয়ার সাধনায় বৈষ্ণবের সঙ্গে সংস্কৃত ও অন্যান্য বাংলা প্রেমসাহিত্যের পার্থক্য লক্ষণীয়।

শ্রীরাধা বলেন—

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।

একাত্মবোধের ব্যথামধুর অথচ দৃপ্ত এই বাণীতে নারী-মনের

১ বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

২ পদামৃতমাধুরী

অতুলনীয় অভিব্যক্তি ঘটেছে। সহজ প্রাপ্তির সুখের চেয়ে অতি দুঃখে, বহু সাধনায় অর্জিত সফলতা পরম আনন্দ দেয়। নারী-হৃদয়ের বেদনামধুর আত্মোৎসর্গের বাসনাতেই শ্রীরাধিকা উদ্বুদ্ধ। যথার্থ প্রেমে প্রেমাস্পদের কোনো অপূর্ণতাই পীড়া দেয় না। নারীর প্রেম পুরুষের সমস্ত দোষত্রুটিকে সস্নেহ প্রশ্রয়ে মেনে নেয়, ক্ষমা এবং উদারতায় প্রেমকে মহিমান্বিত ক'রে তোলে। এইজন্যই শ্রীরাধা কৃষ্ণের দোষত্রুটিকে বিচারের অতীত ব'লে মনে করেছেন, গুণাগুণ বিচার করেন নি, ক্ষুব্ধ হন নি ; কৃষ্ণের দেওয়া কষ্ট অমৃত ব'লে গ্রহণ করেছেন। নারী-মনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সমস্ত অনুভূতিগুলি রসমূর্তি পেয়েছে শ্রীরাধার মধ্যে—

> দোষাঅপি প্রিয়তমস্য গুণা যতঃ স্যুঃ
> তদ্দত্ত কষ্ট শতমপ্যমৃতায়তে যৎ।
> তদ্দুঃখলেশ কণিকাপি যতো ন সহ্যা
> ত্যক্ত্বাত্মদেহমপি যং ন বিহাতুমীষ্টে।
> যোহসন্তমপ্যনুপমং মাহিমান স্বচ্চৈঃ
> প্রত্যায় যত্যনুপদং সহসা প্রিয়স্য ॥
> প্রেমা স এব···।[১]

এ-প্রেম ভগবৎ অভিমুখী হোক বা মানব অভিমুখী হোক, সকল প্রেমের পক্ষেই এ-কথা যথেষ্ট।

রাধা যখন বলেন—

> এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
> এ ভরা বাদর   মাহ ভাদর
>   শূন্য মন্দির মোর।

তখন বিদ্যাপতির রাধার এই ব্যাকুলতায় বিশ্ববিরহীর ক্রন্দন

১ প্রেমসম্পুট, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

জেগে ওঠে। কালিদাসের বিরহী যক্ষ একদিন ব্যাকুল বিচলিত হয়েছেন, আজও নিবিড় বর্ষায় মর্ত্যের দয়িত-দয়িতা এমনি ক'রে ব্যাকুল হয়, চিরকালই হয়েছে। বিশ্বরহস্যের বাসর-কেন্দ্রে রস-নিবিড় অনিবার্য আকর্ষণে এদের যাত্রা। তাই তত্ত্বগত প্রভেদ যা-ই থাক, শিল্পগত রূপায়ণে কালের বিবর্তনে যুগ-পরিবেশে যে-পার্থক্যই দেখা দিক, মর্মগত প্রকৃতিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের সঙ্গে মর্ত্যপ্রেমের নিগূঢ় যোগ রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম একদিন মানবসমাজকে ভাববিহ্বল ক'রে তুলেছিল, বহুবর্ষ পরে আজও তা তেমনি উন্মাদনাময়। কারণ একটি বিশেষ মানব-মানবী উপলক্ষ হ'লেও এ-প্রেম নির্বিশেষ মানবসমাজের নির্বিশেষ প্রেম।

রাধা কৃষ্ণের জন্য ঘরকে বাহির আর বাহিরকে ঘর করেছেন। বৈষ্ণবীয় এ-প্রেমোৎকণ্ঠা লৌকিক প্রেমেও সম্ভব। যুগে-যুগে নারী কি ক'রে ঘরকে বাহির আর বাহিরকে ঘর করেছে এবং সমস্ত বিরুদ্ধাচরণকে অতিক্রম ক'রে সংসারের সংকট-বন্ধুর রাজপথে প্রেমাভিসারে যাত্রা করেছে, তার পরিচয় রয়েছে পরবর্তী মৈমনসিংহগীতিকা থেকে আধুনিক প্রেমসাহিত্য পর্যন্ত। বৈষ্ণবীয় প্রেমের মতো আক্ষেপ, অনুরাগ, অভিমান, বিরহ-ব্যাকুলতা, প্রগাঢ় তৃষ্ণা, অভিসারযাত্রা, তন্ময়তা, আত্মসমর্পণ এ-সমস্ত মানুষেও সম্ভব বৈকি। শাস্ত্র এবং সাহিত্য— এ দুয়েই মনুষ্যজীবন প্রতিবিম্বিত হয়, কারণ যা মানুষের সৃষ্টি তা মানুষী-ভাবাতীত হ'তে পারে না। (রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে তরঙ্গিত ক'রে রেখেছে অসীম বিরহ। আর আশ্চর্য এই অনির্দেশ্য বিরহ পুরুষের দিক থেকে নয়, নারীর অন্তর্লোকের দুঃখসাগর মন্থনেই তার জন্ম।)

এই দেহ, এই রূপ, এই মর্ত্যজীবনের প্রেমকে অবলম্বন

ক'রেই বৈষ্ণবের শ্রীরাধা মহাভাবের বন্যায় দুর্জয় বেগে ভেসে চলেছেন, ছুটে চলেছেন নক্তন্দিব উদ্বোধনের তালে-তালে মহাসাগরসংগমে মিলিত হ'তে। প্রেমের এই যে আশ্চর্য রূপ— বেদনার সাগরমন্থনে যা উত্থিত, হৃদয়কে যা অনাবিল রসে নিষিক্ত করে— সেই সান্দ্র অনুভবেরই দোসর রবীন্দ্রপ্রেম। বৈষ্ণবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য অন্তর্মুখী আবেগ ও গভীরতা, রবীন্দ্র-প্রেমের সঙ্গে এইখানে তার একাত্মতা।

বৈষ্ণবপ্রেমের তত্ত্বকথা এই যে, কৃষ্ণলীলার স্বরূপ-আস্বাদনে মানবপ্রেম আরোপিত। বৈষ্ণবের অন্তর তন্ময়; বৈষ্ণবকবি রাধা-কৃষ্ণের মধ্যেই প্রেমকে সীমাবদ্ধ রেখে আত্মহারা, আত্মজ্ঞানরহিত, তাঁর কাছে বিশ্বের রূপ হারিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথে তা অসম্ভব, বিশ্বের পটভূমিতে এবং আপন সত্তা-সাযুজ্যেই তাঁর প্রেমের পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধির বাসনা। বৈষ্ণবকবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সংসারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান নি। সংসারবিমুখ না হ'লে সেই একাত্ম একমুখিনতা ব্যাহত হ'ত। সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেম। অতল হৃদয়ের ভাবকে সংসারের গণ্ডিতে টেনে আনলে সীমিত হ'য়ে পড়ে— বাস্তবে যে সে-ভাব ধরা দেবে না বৈষ্ণবকবিরা তা প্রথম থেকে ধ'রে নিয়েছেন। সংসারে সামঞ্জস্য করতে গেলে আদর্শ খর্ব হ'য়ে অনর্থ বাধে; তাই কৃষ্ণ রাধাকে ডেকেছেন বাঁশিতে, আর তাঁদের মিলন হয়েছে যমুনাপুলিনে।

রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যেও জীবন এই রসের ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমাজের মানুষ, তাই সে-প্রেম সংসারবিমুখ নয়, সমাজ-সংসারের পটভূমিতে ঐ সীমাহীন হৃদয়ভাব আর সীমিত বাস্তব পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রপ্রেমে আদর্শ ও বাস্তব এ দুয়ের সমন্বয়ের যেমন চেষ্টা আছে, তেমনি আছে স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধির প্রয়াস।

'যে ভালোবাসা ব্যাপ্ত আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হ'য়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই' —বলেছে "শেষের কবিতা"য় অমিত রায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম বিশ্লেষিত হয়েছে নারী এবং পুরুষ উভয়ের দিক থেকেই। আগেই বলেছি বৈষ্ণবকাব্যের বেদনা মূলত নারীহৃদয়ের। বৈষ্ণব প্রেমিকা বিদ্রোহিনী, তিনি সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে অভিসারযাত্রা করেছেন, তাঁর কাহিনী করুণ ও অশ্রুসিক্ত। অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁকে অঙ্গীকার করতে হয়েছে নীরবে। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমিকা দুঃখকে অঙ্গীকার করেছে কিন্তু লাঞ্ছনা সহ্য করার মতো নির্বিরোধ প্রকৃতি তার নয়। উপরন্তু বৈষ্ণবকাব্যে পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের বাস্তব দিকটি উপেক্ষিত, নারী-পুরুষের জীবনের জটিলতার দ্বন্দ্বও সেখানে স্থান পায় নি।

বৈষ্ণবীয় প্রেমাদর্শ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্যে স্ব-স্ব আদর্শ অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। প্রেমে যৌবনের প্রাণস্ফূর্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু মানুষের জীবনে যেমন চপল যৌবনের বয়ঃসীমা নির্ধারিত তেমনি প্রেমেও ভোগারতির স্থান সংকীর্ণ, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বৈষ্ণবকবিরা সেটুকুও বর্জন করেছেন। কিন্তু উদ্ভিন্ন যৌবনের দেহলাবণ্যের মনোহারিত্বকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, বৈষ্ণবকাব্যে এর যে-বর্ণনা আছে তা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপিত করে। বৈষ্ণবপ্রেমের মূলে রয়েছে মহৎ ভাবোদ্দীপনা। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যেও এই যৌবনের দেহ-লাবণি-মুগ্ধতা আছে, মানুষের ভোগবাসনার স্বীকৃতি আছে, কিন্তু সে-প্রেমের সুনিবিড় অভীপ্সা— দেহ ও মনের সংগতিরক্ষা। সে-প্রেমের গূঢ়ার্থ দেহকে ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ ভাবপরিমণ্ডলে মানসিক

সত্তার বিকাশ ; মানুষের অন্তরজীবনের ব্যাপ্তি, সমৃদ্ধি— জীবন-ধর্মের সামগ্রিক রস-উপলব্ধি।

চণ্ডীদাসের প্রেমে দয়িতকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু উপভোগের বাসনা নেই। এখানেই বৈষ্ণব ও রবীন্দ্র -প্রেমের অভিন্নতা। মহৎ দুঃখই মহৎ প্রেমের স্বরূপ। বৈষ্ণবপ্রেমের মূল সুর বিরহ। চণ্ডীদাসের রাধা

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

"লিপিকা"য় আমরা শুনতে পাই, 'প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না ; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।'

দুঃখের আগুনে, ত্যাগের আগুনে পুড়ে যখন মন নিখাদ হয় তখন ঐ মর্মব্যথাই দেহধারী মানুষের প্রেমকে করে পবিত্র, মহিমান্বিত, আর সেই প্রেমই হয় মনুষ্যত্বের নিদান, মানুষই পায় দেবতার আসন।

বিরহে, ত্যাগে কালিদাসের শকুন্তলা

বসনে পরিধূসরে বসনা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণীঃ।[১]

রবীন্দ্রসাহিত্যেও প্রেমে বলিষ্ঠ মননশীলতা, আবেগ ও বীর্য-বত্তার সংমিশ্রণ। আধুনিক যুগপরিবেশে সে-প্রেম ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠায় সমৃদ্ধ, তথাপি দুঃখের তপস্যা-পরিশোধিত রূপই সে-প্রেমের যথার্থ স্বরূপ—

বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।

১ সপ্তম অঙ্ক, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

আধুনিক কালের বাংলাসাহিত্যে— কি কবিতায়, কি গল্পে— লেখকের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণী তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানী দৃষ্টির পাশাপাশি আর-একটি ধারা বহমান— যার দৃষ্টি সহজ, স্নিগ্ধ ও শান্ত। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে গল্প বা উপন্যাস ছিল না, কিন্তু সে-যুগের কাব্যে দেখি একদিকে বৈষ্ণবকবিদের অ-লৌকিক নরনারীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-মণ্ডিত প্রেমলীলা— আর তারই পাশে সাধারণ মানুষের লৌকিক ভালোবাসার পরিবেশে রচিত পূর্ববঙ্গগীতিকা, মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি পল্লীপ্রেমকাব্য।

মঙ্গল ও বৈষ্ণব কাব্যের পরবর্তীযুগে বাঙালীসমাজে যাদের জীবন রঘুনন্দনের বিধিবিধানে বাঁধা পড়ে নি, যারা সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে স্থান পায় নি, তারাই সৃষ্টি করেছিল মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকার মতো পল্লীপ্রেমকাব্য। অজ্ঞাত-পরিচয় কবিদের রচনায় শিল্পকারুতা না থাকলেও তাঁদের কাব্য অপটু প্রকাশেও সহজ, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম।

তত্ত্বকথার সঙ্গে যোগ ছিল না ব'লেই সম্ভবত এই পল্লীগীতিগুলিতে সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখবেদনার স্বাভাবিক আবেদন কবির লেখনীতে সহজ স্বীকৃতি পেয়েছে— দার্শনিক তত্ত্বে বা দেব-প্রশস্তিতে তা পর্যবসিত হয় নি। এই কাব্যে বৈষ্ণবপ্রেমের উত্তুঙ্গ ভাবতন্ময়তা নেই কিন্তু অলক্ষ্য প্রেরণা অনুভূতি এর প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের অন্তরে বিদ্যমান— যা তাদের প্রেমকে বিদ্যাসুন্দরের স্থূলত্ব থেকে অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে নিয়ে গিয়েছে; আর, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার নগরজীবনের প্রেমের সঙ্গে গ্রামের সহজ অথচ দৃঢ়চেতা মানুষগুলির প্রেমের প্রকৃতিতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

বাংলার বিশিষ্ট প্রাণধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণবকাব্যের নায়িকার ও এইসব পল্লীগীতির নায়িকার প্রেমে অনেক সময় আশ্চর্য ভাব-সাদৃশ্য দেখা যায়। বৈষ্ণবকবিরা সমাজের বিধিনিষেধ বাস্তব-ভাবে উপেক্ষা করতে না পারলেও ভাবের ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার রাশ আলগা ক'রে দিয়েছিলেন, আর নিভৃত পল্লীর নিরক্ষর এই জনগণের সমাজজীবন ছিল অনেকখানি স্বাধীন, স্বভাবধর্মের অনুকূল। তাই যে-হৃদয়বৃত্তিটির চিরন্তন অনুভূতি স্বভাবসুকুমার অথচ ঘাতপ্রতিঘাতে প্রলয়ংকরী, তার রূপ পল্লীকবিরা যেমনটি জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তেমনি ফুটিয়ে তুলেছেন— ফলে মূর্তিমতী ভাবসাধিকা শ্রীরাধার প্রেমসাধনায় ও পল্লীপ্রেমিকার প্রেমে স্বাজাত্য দেখা দিয়েছে।

এই পল্লীবালাদের অনুরাগ আন্তরিক কিন্তু প্রকৃতি কিছুটা দুর্দম্য ; এরা আবেগপ্রবণ, কমনীয়, অথচ অপ্রতিরোধ্য ও নির্ভীক। হৃদয়ের এই দ্বৈজাত্যই বোধ হয় বাংলার বিশিষ্ট প্রাণধর্ম। এই দ্বিজাতীয় প্রাণধর্মের প্রসাদেই বাংলার পল্লী-প্রেমগীতিকায় বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে।

বাংলার পল্লীরমণীদের এ-প্রেম আধ্যাত্মিক নয়। রক্ত-মাংসের মানুষ তারা। কিন্তু তাদের প্রেম শুধু করুণ কোমল নয়। অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সংঘাতে সে-প্রেম প্রবল রূপ ধারণ করেছে অনেক সময়— অথচ দুঃখে, ত্যাগে, ধৈর্যে, ক্ষমায় সে-প্রেম রাধা-প্রেমেরই সমকক্ষ। এদের প্রেমের আদর্শও প্রিয়ের জন্য সর্বস্বত্যাগ, দুঃখবরণ। পল্লীপ্রেমিকাও কুল, ভয়, মান ত্যাগ করেছে— সম্পদ ছেড়ে দারিদ্র্য বরণ করেছে ; এক কথায়, দেহ মন প্রাণ সবই সমর্পণ করেছে, কিন্তু তবু তাদের প্রেমের পথ চির-মিলনে চরিতার্থ হয় নি— অধিকাংশ প্রেমকাহিনীর পরিণতি হয়েছে বিষাদে।

মৈমনসিংহগীতিকার আলোচনা-প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঠিকই বলেছেন— 'এই পল্লীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু কখনও নারীধর্ম ত্যাগ করেন নাই।'

পরবর্তী যুগে, রবীন্দ্র ও শরৎ -সাহিত্যে এবং আমাদের কালে প্রেমের ক্ষেত্রে নারী যে-মর্যাদা পেয়েছে, তার মূল সুরটি ধরা পড়ে প্রথম বৈষ্ণবকাব্যেই। সেই ধারাই বিভিন্ন লোক-গাথাগীতিকার মধ্য দিয়ে ব'য়ে এসেছে এবং বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্যসাধন করেছে। তারপর শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলার সমাজজীবনে যে-ভাবসংঘাত ঘটেছে, যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এসেছে, তারই ফলে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে পেয়েছি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতিতে স্বাধীন প্রেমের মর্যাদা স্বীকৃত— সেখানে কোথাও মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়ধর্ম উপেক্ষিত হয় নি কবির সামাজিক বিধিবদ্ধ নীতিবোধের কাছে। পল্লীকাব্যের প্রণয়ী-প্রণয়িনীগণ ঋষিবচনের প্রতীক্ষা না ক'রেই পরস্পর পরস্পরকে আত্মদান করেছে এবং নারী দুর্জয় অনুরাগকে শত লাঞ্ছনাতেও আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা দিয়ে রক্ষা করেছে। এইজন্যই সে-প্রেমের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নানা বৈচিত্র্য— সম্ভব হয়েছে কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, মহুয়ার নির্ভীকতা ও আত্মদান, মলুয়ার নিষ্ঠা এবং ব্যর্থ প্রণয়িনী চন্দ্রাবতীর আজন্ম কুমারীব্রত।

এই সকল প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের একেবারে বাল্যবয়সে বিবাহ হয় নি এবং কৌমার্যেই তাদের অন্তরে প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। মৈমনসিংহগীতিকার প্রেমিক-প্রেমিকাদের স্বাধীন মনোনয়নের জন্যই পূর্বরাগের বর্ণাঢ্য লীলা আজকের দিনের সোফিস্টিকেটেড মনকেও মুগ্ধ করে। কিন্তু তবুও দাম্পত্যপ্রেমই

তাদের আদর্শ। তাদের সুনিবিড় দাম্পত্যজীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলক্ষিত দিক থেকে বিপর্যয়ের আঘাত এসেছে, দুঃখ-দুর্দশা ঘটেছে, বাইরের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের জীবনে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে :

তোমার ঘরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে।
এতেক করিলে তোমার গর্দান যদি বাচে॥

এই ধরনের বিপর্যয় মহুয়া, মলুয়া, কমলার জীবনকে ছারখার ক'রে দিয়েছে, তাদের সুখের সংসার বিধ্বস্ত করেছে। অবশেষে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়েই কাহিনীর পরিসমাপ্তি—

কলঙ্কজীবন মোর ভাসাইব সাগরে
এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে॥ ····
পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥

কেন যে শান্ত সুন্দর সুখের সংসারটিতে আচমকা ঝোড়ো হাওয়া এসে উপস্থিত হয় আর ভেঙেচুরে সব তছনছ ক'রে দিয়ে যায়, তা বোঝা কঠিন! অদৃশ্য নিয়তির অমোঘ বিধান থেকে মানুষের বুঝি পরিত্রাণ নেই, প্রতিবিধানের উপায়ও নেই।

এই প্রেম সংসারবিমুখ নয়, শুধু ভাবোল্লাসে এর পরিতৃপ্তি নেই; এই পল্লীপ্রেমকাহিনীর নরনারী পরস্পরকে রক্তমাংসের দেহমনে আকাঙ্ক্ষা করেছে। নায়ক নায়িকাকে বলছে—

তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুব্যা মরি।

মিলনের পথে এরা সমস্ত বাধাবিঘ্নকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, দুঃখদৈন্যেও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম পরিহাসে, নিদারুণ আঘাতে এ-প্রেমের উপসংহার হয়েছে বড়ো করুণ, বড়ো মর্মস্পর্শী। নারী সংগ্রাম করেছে নিষ্ঠুর

বহিঃশক্তির সঙ্গে, কিন্তু তার প্রেমে এমন কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি যাতে তার কোনো বিশেষ সংস্কারের সংগ্রামে হৃদয়মাধুর্য ক্ষরিত হয়। মঙ্গলকাব্যেও এ-ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

বৈষ্ণবনায়িকার প্রেম সম্বন্ধে বলা যায় যে, সে-রমণী সমাজ-বিদ্রোহী ; কিন্তু সেই বিবাহিত নারীর প্রেমেও সচেতন সংস্কারের সঙ্গে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি, যদিও সামাজিক বাধাবিপত্তি তাকে নানাভাবে দগ্ধ করেছে। বৈষ্ণবকাব্যে পরকীয়া প্রেমের প্রতিষ্ঠা হ'লেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-প্রক্ষেপে সে-প্রেমের স্বরূপ ভিন্ন হ'য়ে পড়েছে। তবুও সমাজ-অনুশাসনে ব্যক্তিসত্তা অনেক সময় পীড়িত হয়, বিড়ম্বিত হয়— এ-চেতনা বৈষ্ণবকাব্যের উৎসমুখেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। আর মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা প্রভৃতিতে রয়েছে স্বাধীন প্রেমের বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। সে-প্রেম দেহের আধারে সাধারণ মানুষের সহজ চাওয়া-পাওয়ার রঙে রসে রাঙানো, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আবরণে আবৃত নয়।

২ ॥ রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যে প্রেমের রূপ

. . . .

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মানসজীবনে উদ্দীপ্তি দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের ভাবসংঘাতে, আর তারই ফলে বাংলাসাহিত্যে দেখা দিল জীবননিষ্ঠা। নিধুবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে রবি-আবির্ভাবের পূর্বলগ্ন পর্যন্ত বাঙালীর মানসজীবন নানা দ্বন্দ্ব ও সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিল।

মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি পল্লীগাথায় যে-প্রেম ব্যক্ত হয়েছে তা ব্যক্তিবিশেষের দুর্জয় দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার আবেগ ছাড়া কোনো মহাভাবদ্যোতনায় বা কোনো সুউচ্চ আদর্শে অভীপ্সু নয়। কিন্তু এ-কথা বলা অসংগত হবে না যে, সে-প্রেমের বেগবতী ধারা উনবিংশ শতাব্দীর কবিগান ও বিভিন্ন সংগীতে রচয়িতাগণ অব্যাহত রেখেছেন— যদিও অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত কবিওয়ালাদের হাতে বাস্তব মানুষের প্রেমে বলিষ্ঠ বীর্যবত্তা বা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে নি। মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতিতে যে অলিখিত বিধি সেই পল্লীকাব্যকে মার্জিত রূপ দিয়েছে, আন্তরিক অনুভূতি যে-রসের সৃষ্টি করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল কবিগানে তার একান্তই অভাব। বোধ হয় একমাত্র নিধুবাবুর গানে আমরা এই আন্তরিকতার স্পর্শ পাই।

গানে কাহিনীর বিস্তৃতি থাকে না—বিশেষ একটি মুহূর্ত, অনুভূতিই শুধু অভিব্যক্ত হয়। নিধুবাবুর গানে প্রেমিকহৃদয়ের বিরহার্তি, প্রতিদান-প্রত্যাশাহীন ভালোবাসা, প্রেমাস্পদের সকল দুঃখে দুঃখ এবং আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। কেবল চোখের দেখাতেই প্রেমিকা আশ্বস্ত।

অমর করেছ রে প্রাণ প্রেমসুধাদানে।
আর কি বধিতে পার বিচ্ছেদেরি বাণে॥[১]

এই সব গান অনুল্লেখ্য নয়। নিধুবাবুই প্রথম সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃত প্রেমের গান রচনা করলেন। তাঁর সে-গানে বিরহের ব্যাকুলতা ও বৈচিত্র্য কখনো-কখনো প্রকাশ পেয়েছে।

যেমন—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্মাণ।[২]

অথবা—

সখি কোথায় পাব তারে যারে প্রাণ সঁপিলাম।[৩]

কিন্তু নিধুবাবুর গানে একই ধরনের বিবরণ, ইনিয়ে-বিনিয়ে বিরহিণীর বৈঠকী কান্না মনকে অবসাদগ্রস্ত ক'রে তোলে। সুরকে বাদ দিয়েও বৈষ্ণবপদের যে-কাব্যমূল্য আছে, যে আন্তরিক ভাব-সম্পদ ও সৌন্দর্যকল্পনার রূপচ্ছবি আছে নিধুবাবুর প্রেমের গানে তা অল্পই দেখা যায়।

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি কেবল আমার॥[৪]

১ গীতাবলী, পরাণদাস কর্তৃক প্রকাশিত
২ ঐ
৩ ঐ
৪ ঐ

উদাসীন প্রণয়ীকে উদ্দেশ ক'রে এই বিশেষ ধরনের অভিযোগ বহুবার শোনা যায়। কোনো মহৎ ভাব নেই, মহৎ দুঃখ নেই, কেবল প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে মান-অভিমান, কেবল কাঁদুনি। সুতরাং যদি বলি মহৎ দুঃখবোধের অভাবে নিধুবাবুর প্রেমের গানে তেমন গাঢ়তা নেই, বোধ হয় খুব অন্যায় বলা হবে না। নিধুবাবুর মধ্যে আন্তরিকতাও প্রকাশ পায় নি অনেক সময়।

মদনের পঞ্চশর কোকিলের পঞ্চমস্বর
শরে শরে শরজাল বুঝ অনুমানি।[১]

এ-বর্ণনায় বিরহী হৃদয়ের বেদনার প্রকাশ কোথায়? সে যা-ই হোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের রীতি ছেড়ে কবির নিজস্ব বেদনা নিজের জবানীতেই প্রকাশ পেল এই গীতরচয়িতা ও কবি-ওয়ালাদের সৃষ্টিতেই।

ঈশ্বর গুপ্তের অভিনবত্ব ছিল ব্যঙ্গকৌতুক রচনায়। নিছক প্রণয় নিয়ে যতটুকু তিনি রচনা করেছেন তাতেও দেখা দিয়েছে কৌতুকদৃষ্টি। বৈচিত্র্য বা বিশেষ কোনো আদর্শ ঈশ্বর গুপ্তের প্রেমের কবিতায় নেই। সাধারণ ঘরোয়া আটপৌরে প্রণয়কথা কৌতুক ক'রে বলেছেন মাত্র। না আছে তাতে কোনো উচ্চশ্রেণীর ভাব-কল্পনা, না হয়েছে তাতে কোনো রসসৃষ্টি। তবুও বিশেষত্ব এইটুকুই যে, ব্যঙ্গকৌতুকের অন্তরালে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের ক্ষত এবং ক্ষোভ মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়েছে।

ভোলে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট॥
সময়েতে নাহি করে প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।[২]

১ গীতাবলী, পরাণদাস কর্তৃক প্রকাশিত

২ ঈশ্বর গুপ্ত গ্রন্থাবলী

তখন শুধু নায়কের খেদ নয়, বোধ করি স্বয়ং কবির খেদোক্তি শোনা গেল। কিন্তু এই প্রেমের কবিতা নিছকই স্থূল সুখস্বাদ।

আগেই বলেছি মৈমনসিংহগীতিকা প্রভৃতি পল্লীপ্রেমগাথার যে উন্মাদিনী বেগবতী ধারা বাংলাসাহিত্যে বহমান, পাশ্চাত্ত্য ভাবনা-ধারণার প্রেরণা নিয়ে মধুসূদন তাকে অব্যর্থ গতিমুখে যৌবনপ্রাণোচ্ছল রসসঞ্চারে প্রবাহিত করেছেন। বিশিষ্ট চিন্তায়, বিশিষ্ট মনোভঙ্গিতে, নানা রঙে রঞ্জিত হ'য়ে, বিশ্লেষণী শক্তির নব-নব বিচ্ছুরণে পরিপুষ্টি লাভ করেছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সেই ভোগবতী— মধুসূদনের হাতেই তার সর্ববন্ধন-মুক্তি ঘটেছিল।

বাংলাসাহিত্যে দুকূলপ্লাবী বিপ্লব এনেছিলেন মধুসূদন। জীবনের জয়গানমুখর ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে তাঁর বীরাঙ্গনা-কাব্য একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যেই আধুনিক রোমান্টিক প্রেম প্রথম দেখা দিল বাংলা কাব্যজগতে। জীবনঘনিষ্ঠ প্রেম-পিপাসার সঙ্গে নির্ভীক বোধ যুক্ত হ'ল। প্রেম আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। তার পিছনে যে মানবিকতা ও ব্যক্তিত্ববাদের পাশ্চাত্ত্য ভাবনা-ধারণা এবং জীবনাবেগের প্রেরণা ছিল এ-কথা সর্বজনবিদিত। মানুষের স্বাভাবিক বাসনা-কামনার অকৃত্রিম স্বীকৃতি বাংলা কবিতা প্রথম পেল, বাণীনির্মিতির কুশলতায় মধুসূদনের লেখনীমুখে। কোনো তত্ত্বের আবরণে, কোনো আধ্যাত্মিকতার আভরণে তা ঢাকা ছিল না। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাকাব্যে এই মর্ত্যজীবন-রস-পরিচয় এমনভাবে আর কোথাও ফুটে ওঠে নি।

মধুসূদনের জীবনের গতি ছিল যেমন দুর্দম, সাহিত্য-আদর্শও ছিল তেমনি দুঃসাহসিক। তাঁর উদ্দাম স্বভাবে ভীরুতার দৈন্য ছিল না— ছিল না সংস্কারের অলঙ্ঘ্য বন্ধনবাধা। মধুসূদনের

প্রাণের আবেগ কামনা কল্পনা তাঁর কাব্যস্রোতে ব'য়ে নিয়ে এল বাঙালীর অভ্যস্ত চিন্তাধারায় চাঞ্চল্য ও বিপ্লব। মানুষের সহজাত অথচ দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে মধুসূদন দেখলেন মানবিক দৃষ্টিতে। তিনি তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাচীন ভারতগাথার সর্বজনপরিচিত চরিত্রগুলির স্খলন-পতন-কলঙ্ক স্খালন ক'রে তাদের চিরকালীন মানবমূর্তি প্রকাশ করলেন। বিবাহনিরপেক্ষ পরকীয়া প্রেমের কল্পনাও মানুষী সীমায় নেমে এল। আমাদের চিরসঞ্চিত সংস্কারকে সজোরে নাড়া দিয়ে এনে দিল তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর প্রেমকাব্যের উপাদান তৎকালীন যুগজীবন থেকে সংগৃহীত নয়। সমসাময়িক বাঙালীসমাজের নারীর মধ্য থেকে তারার ন্যায় স্পর্ধিত চরিত্র সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করা কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের শালপ্রাংশু বীর্যশালী নরনারীই তাঁর কাব্যের উপযুক্ত নায়ক-নায়িকা। চিরপ্রচলিত দাম্পত্যপ্রেমেও শুধু করুণ কোমল মাধুর্য নয়, দৃঢ়তা ও শৌর্যের সমন্বয়ে তিনি অজস্র অভিনবত্ব এনেছেন। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে মধুসূদনের মানবিক দৃষ্টিতেই পরবর্তীযুগে সৃষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের চিত্রাঙ্গদা, কচ ও দেবযানী; আর, রূপান্তরিত হ'য়ে তারা আজকের জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত। বাঙালী-মানসে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের যে উত্তুঙ্গ রসপিপাসা, সে-তৃষ্ণাও কবি মধুসূদনের হৃদয়ে জেগেছে। তাই তাঁর জিজ্ঞাসা—

বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গভূমিতলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা?

মধুসূদনের প্রেমাদর্শ-প্রসঙ্গে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তারার পাশে স্বতই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'-এর দেবযানীকে। এই দুই প্রেমকাব্য বিচার করলেই দুই প্রেম-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণীত হবে। তারা ও দেবযানীকে মনে হয়

সগোত্র। কিন্তু তবুও মধুসূদনের তারা ও রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। কাহিনী-নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মধুসূদন এক হিসাবে অনেক বেশি নির্ভীক এবং রীতিমতো দুঃসাহসের পরিচয়ও দিয়েছেন প্রেমিকা-নির্বাচনে। দেবযানী গুরুকন্যা আর তারা গুরুপত্নী। দুটি কবিতাতেই কিন্তু অতীতের প্রেমকাহিনীর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে নতুন মনোজগৎ। তারা ও দেবযানী—উভয়েরই কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশ। তারা প্রণয়ভিক্ষু প্রেমাস্পদের কাছে আত্মনিবেদনব্যগ্র, আর দেবযানী তার কুমারীহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছে কচের উদ্দেশে।

তারা সোমদেবকে বলেছে—

এ প্রেম বঁধু আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত ; কিন্তু ধিক্ বৃথা চিন্তা তোরে।
কে পারে লুকাতে কবে জলন্ত পাবকে ?
এস তবে প্রাণসখে ! তারানাথ তুমি
জুড়াও প্রাণের জ্বালা !

তার হৃদয়াবেগ প্রকাশে কোথাও আবরণ রাখে নি সে। স্বচ্ছন্দে সে বলতে পেরেছে—

এস তুমি ; এস শীঘ্র। যাব কুঞ্জবনে
তুমি হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে !
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেমউদাসিনী—
আমি ! যথা যাও যাব ; করিব যা কর ;—
বিকাইব কায়মন তব রাঙা পায়ে !

ভারত-মহাকাব্যের তারার এই সাহস ছিল না ; আগেই বলেছি সমসাময়িক বাঙালীসমাজও কবির প্রেরণা যোগায় নি ; তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্যের বলিষ্ঠ জীবনবাদের প্রেরণায়। এই যে মনের কামনার এমন স্বীকৃতি, এমন অকৃত্রিম প্রকাশ—

এর শিল্পরূপ মধুসূদনের আগে বাংলাসাহিত্যে সূচিত হয় নি। মধুসূদনের কাব্যেই প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণ মানুষের মতোই আসঙ্গলিপ্সায় প্রেমসম্ভোগ করতে চেয়েছে।

দেবযানীও পরিণতবয়স্কা, ব্যক্তিত্বশালিনী ; মনোভাব গোপন করবার দুর্বলতা তার নেই, প্রকাশ করতেও শরম শঙ্কা নেই। তবু কুমারীসুলভ শোভনতা ও আবরণ আছে। তারার উদগ্র কামনার প্রকাশ নেই তার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাকে অর্পণ করেছেন তাঁরই নিজস্ব স্বভাব-সংযম। প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে কিছু বলতে দেবযানীর বেধেছে, অথচ নিজের কথা জেনে নিতে কতই না তার আগ্রহ!

দেবযানী—

হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আর কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাস দুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে ;···

কচ—

চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

এই আশ্বাসবাণী পেয়েই তবে দেবযানী নিজেকে ধরা দিয়েছে, যদিও আগাগোড়াই ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিল সে। কচকে সে যে ভালোবেসেছে প্রথম দিন থেকেই। দেবযানীর এই দ্বিধাটুকুই আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবযানী ও তারা দু-জনেই আত্মসচেতন। এ দুই ব্যক্তিত্বই প্রচণ্ড, থরথর আবেগকম্পিত। দেবযানীর মন নির্দ্বন্দ্ব, তারার পক্ষে অন্তর্দ্বন্দ্বই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে-আভাস দিয়েছে তাতে তার প্রেমের মহিমা খর্ব হ'য়ে গেল—

জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ?……
কর্মনাশাপাপপ্রবাহিণী
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?

এই গ্লানিকে সে শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে উঠেছে অবশ্য, তবু জগতের সমক্ষে তার প্রেমকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি, কারণ তারা নিজেই তার মহত্ত্ব সম্পর্কে নিঃশঙ্ক নয়। মর্ত্যবাসীর পক্ষে দেহতৃষ্ণার হাহাকারকে অস্বীকার করবার উপায় নেই সত্য, কিন্তু যদি বাস্তব-প্রাপ্তির সৌভাগ্য না হয়, মিলনের উপায় যদি না থাকে, তবুও যে সেই অপ্রাপ্ত প্রেমে পরম সান্ত্বনা থাকতে পারে— মধুসূদনের রোমান্টিক প্রেমের ধারণায় এই মহৎ উপলব্ধির দৈন্য আছে। হাতে-হাতে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব না মিটিয়ে দিলে তারার তৃষ্ণার শান্তি নেই ; একান্তেই সে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার কামনা করে— যৌবনকে সে উপভোগই করতে চায়, উজাড় ক'রে দিতে চায়।

যদি দয়া থাকে, এস শীঘ্র করি।
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়…।…
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।

যৌবনের জ্বালা তারাকে অস্থির অসহিষ্ণু ক'রে তুলেছে। মধুসূদনের আবেগ কর্তব্য সংসার সব-কিছুকে প্লাবিত ক'রে তীব্র বেগে, দুর্জয় আকাঙ্ক্ষায় ছুটে যায় একটি হৃদয় থেকে আর-একটি হৃদয়ে; স্ফুলিঙ্গে বহ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করে। দেহতৃষ্ণার প্রবল আসক্তি সর্বনাশা উন্মাদনায় সব ভেঙেচুরে তছনছ ক'রে দিতে চায়।

তারার এই আহ্বান এবং দেবযানীর প্রণয়নিবেদনের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ আছে— যদিও তারার মতোই দেবযানীও

এ-জীবনেই পাওনাটুকু মিটিয়ে নিতে চায়। কল্পনার স্বর্গলোকের আশ্বাসে তার লোভ নেই, মনও ভরে না। এই বেণুমতীতীরেই কচের সাহচর্যে অভিনব স্বর্গসৃজনেরই তার বাসনা।

মহাভারতের দেবযানী চরিত্রের প্রচণ্ড আদিমতা তাকে এক হৃদয়ের ঘাট থেকে আর-এক ঘাটে নিয়ে এসেছে। সেই উদ্দাম প্রণয়পিপাসু নারী নিশ্চয়ই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে গঠিত নয়, কিন্তু তবু তার স্পর্ধিত আত্মগরিমা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের অভিভূত করে। কবিচিত্তও তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে মনে হয়। কবি ভারত-মহাকাব্যের এই চরিত্রটির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটান নি তাঁর রূপায়ণে ; দেবযানীর আহত অবলুণ্ঠিত প্রণয়মহিমা, তার শূন্য হৃদয়ের হাহাকার শেষ পর্যন্ত অভিশাপের তীক্ষ্ণতম শায়কে কচকে বিদ্ধ করেছে।

কিন্তু এই চির-অতৃপ্তির অপরিসীম বেদনাতেই প্রেম অনির্বচনীয় মাধুর্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠল কচের মধ্য দিয়ে। কচের শেষ ক্ষমার বাণীতে একটি মহৎ সান্ত্বনার ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত। এই ঊর্ধ্ব ভাবভূমির আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল প্রেমই রবীন্দ্রপ্রেমের নিকষিত হেম। একদিকে কর্তব্য আর একদিকে প্রেম। নির্ধারিত কর্তব্যের আহ্বানে যেতে হ'ল তাকে, ব্যগ্র বাহুবন্ধনে ধরা দেওয়া হ'ল না। পুরুষহৃদয়ের এই নিগূঢ় ব্যথা, এই দুঃখ— মহৎ দুঃখ। রবীন্দ্রসাহিত্যে পৌরুষদীপ্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কাব্যটি। এই দূরত্ব, এই ব্যবধান, এই বেদনার রসোল্লাসে 'বিদায় অভিশাপ'-এর প্রেম মহিমার উচ্চতম সুমেরুশিখরে আসন পেয়েছে। দেবযানীর প্রেমের অগ্নিগর্ভ আবেগের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কচের প্রশান্তি যুক্ত হ'য়ে। দুটি আত্মায় যদি নিবিড় বাঁধন পড়ে তবে পরস্পরের মিলনসৌভাগ্যে বঞ্চিত হ'লেও সে-প্রেম সমস্ত দুঃখবেদনা, এমনকি বিড়ম্বনাও হাসিমুখে

স্বীকার ক'রে নেয়। এই নিঃশেষ শান্তি সোনার রেখা এঁকে দিয়েছে 'বিদায় অভিশাপ'-এর শেষ অংশে। মধুসূদনের রোমান্টিক প্রেমে এর কোনো আভাসই মেলে না। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের এই অতৃপ্ত বেদনা জীবনের মহত্তর সংগতির মধ্যে রস-মোক্ষ লাভ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিমন প্রেমের অসহায় বেদনাকে স্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি রক্ষণশীলতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে ইতস্তত করে নি। হৃদয়ধর্মের চেয়ে সমাজধর্মই বঙ্কিমের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। যে-প্রেম বিবাহবন্ধনের স্বীকৃতি পায় নি বঙ্কিমচন্দ্র সে-প্রেমকে কেবলমাত্র রূপপিপাসার তীব্রতা রূপেই দেখিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, ঐ দুর্দমনীয় আসক্তি থেকে কোনো যুগের গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্রের মুক্তি নেই, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক চরিত্রকে তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়ে মর্যাদায় ফুটিয়ে তোলেন নি। বঙ্কিমের বিশেষ মনোভাব তাদের নিয়ন্ত্রিত করেছে, আর প্রকট করেছে শুধু ব্যর্থ নিরাশ্বাস। হীরা, রোহিণী, শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনীর বেদনাদিগ্ধ নারীহৃদয়ের রিক্ততা বঙ্কিমকে নিশ্চয় বিচলিত করেছিল কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞাপরিশীলিত সত্তার বিশেষ সংস্কারটি অবিচল নির্মমতায় ভালো-মন্দের দিকনির্দেশই করেছে, কোনো স্বস্তি কোনো সান্ত্বনার অবকাশ রাখে নি। বিধবা কুন্দের প্রেমের প্লাবনে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত সংস্কার ভেসে গিয়েছে, কিন্তু নগেন্দ্র-কুন্দের মিলিত শক্তি সামাজিক নীতিধর্মের অচলায়তন ভাঙতে পারে নি। তারা দু-জনেই পাপচেতনায় সংকুচিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এই পাপচেতনা থেকে মুক্ত হ'য়েই বা আজকের সমাজ-জীবনের শান্তি কোথায়, স্বস্তি কোথায়? একদিকে পরিণীতা স্ত্রী এবং অপরদিকে সামাজিক-সম্পর্ক-নিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ

প্রণয়িনীকে নিয়ে পুরুষের, আর ঐ পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে দুটি নারীজীবনের, বা এক নারীকে কেন্দ্র ক'রে দুটি পুরুষজীবনের যে-বেদনা ও সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সমাধান কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্র শুধু 'মন্দ' এই কথাটি ব'লে একটা সরল অথচ নির্মম মীমাংসায় উপনীত হ'তে চেয়েছেন। তাঁর পরবর্তীরা বলবেন ভালো-মন্দের প্রশ্ন এখানে নিরর্থক।

বঙ্কিমসাহিত্যে গার্হস্থ্য-দাম্পত্য-প্রেমাতিরিক্ত ভালোবাসার মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা না থাকলেও পূর্বরাগ ও বিবাহপরবর্তী জটিলতার মধ্য দিয়েই পরবর্তী বাংলা-সমাজ-মানসের প্রসার ঘটেছে পরোক্ষভাবে। বঙ্কিমসাহিত্যের নিগৃহীত ভালোবাসার অসহায়ত্ব ও অচরিতার্থতার পথেই উত্তরকালে গৃহবন্ধনাতিরিক্ত প্রেম বিচিত্রভাবে স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

মধুসূদনের পরে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে কাব্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থানে চিহ্নিত হ'য়ে আছেন বিহারীলাল। বিহারীলালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য আত্মতন্ময় ভাবনিমগ্নতা। তাঁর এই ভাবে-ভোলা আবিষ্টতাই সামগ্রিক কবি-পরিচয়। তাঁর কাব্যে প্রেমোৎকণ্ঠা যে-ভাবরূপ নিতে চেয়েছে সুনিপুণ শিল্পকর্মে তা পরিস্ফুট হয় নি। বিহারীলালের প্রতিভার বাহন হ'ল কাব্য। স্বভাবতই সে-কারণে উপন্যাসের দ্বন্দ্ব সমস্যা দেখা দেয় নি তাতে। কিন্তু এই কাব্যিক প্রেমস্বপ্ন ও তার উপলব্ধির সার্থকতা কবি সংসার-সম্পর্কের মধ্যেই পেতে চেয়েছেন— যদিও তাঁর প্রেম-সাধনায় ব্যক্তিগত দাম্পত্যজীবনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর অর্থ খুঁজে পাবার বাসনাও একেবারে অব্যক্ত নয়।

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী পর্বের দু-জন বিশিষ্ট কবি হলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দ দাস। বয়সে জ্যেষ্ঠ হ'লেও উভয়কেই রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বলা চলে। এই

কবিদের কাব্যের প্রধান সুর হ'ল দাম্পত্যপ্রণয়। বিহারীলালের প্রেমকাব্যে ব্যক্তিজীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবার বাসনা আছে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস দাম্পত্য-গার্হস্থ্য-প্রেমকেই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তুলেছেন। এঁদের প্রেমে ঊর্ধ্ব মানসিক বিস্তার নেই— এ-প্রেম সকাম। মহৎ ভাবনার দিশা-জাগানো নয়, সাধারণ বাসনা-ব্যগ্র গার্হস্থ্যপ্রেমেরই আলেখ্য এঁদের প্রেমকাব্য। রবীন্দ্রযুগে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন এই কবিদ্বয়। দেবেন্দ্রনাথ পত্নীর প্রেমেই প্রেমের সকল সার্থকত খুঁজেছেন। সেই নারীকেই তাঁর বন্দনা—

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশুস্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার!
সীমন্ত সিন্দূর তার
চরণ অলক্ত রাগে
ফলাইয়া নবরাগ আঁকি আমি ছবি—
চিরদুঃখী বাঙ্গালার কবি।[১]

মহত্তম আদর্শের কোনো বাণী নয়, তিনি চেয়েছেন সহজ সরল দাম্পত্য-জীবনের পরিধিকে আশ্রয় করতে। তাঁর ইচ্ছা হ'ল— 'দুর্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।' এই গার্হস্থ্য-দাম্পত্য-প্রেমের উদ্দীপনা কিভাবে কবি-চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল তার উদাহরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রেম-কাব্যগুলিতে।

গোবিন্দ দাস আরও স্পষ্টবাদী, পেশীবহুল। দেহের প্রতি আকর্ষণকে অত্যন্ত সত্য ব'লে মনে করেছেন তিনি। স্পষ্ট তাঁর স্বীকারোক্তি—

১ আমি কে। অশোকগুচ্ছ

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
সকলি অমৃত তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহছাড়া প্রেমকথা
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।[১]

প্রেম মানুষেরই; সুতরাং প্রেমের আধার দেহ'। কাজেই প্রেমে ব্যক্তিবিশেষ অত্যন্ত সত্য, তার সঙ্গকামনাও সত্য। মনের প্রকাশ সান্নিধ্যবাসনায়, কথায়, নানা অভিব্যক্তিতে। কিন্তু গোবিন্দ দাসের কবিতার এখানেই শেষ কথা নয়। মানুষের কামতৃষ্ণাকে তিনি তাঁর কাব্যে সহজ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ধরার মানুষ আমি
আমি ভাই মহাকামী।[২]

গোবিন্দ দাসের 'প্রেম ও যৌবন স্বপ্ন' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে আমরা দাম্পত্যজীবনের নানা অভিজ্ঞতার আলেখ্য দেখতে পাই; সুখসম্ভোগের মর্মস্পর্শী স্মৃতিকথাও অনুধাবন করবার মতো। কিন্তু এগুলি বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত। গোবিন্দ দাস বা দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তত্ত্বরসিক দার্শনিক দৃষ্টি নেই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপারতিই তাঁদের প্রেমকাব্যের উপজীব্য। প্রেমের চিরন্তন অতৃপ্ত ঐশী ব্যথা নয়, ঘরোয়া প্রেমের সুনিবিড় পরিতৃপ্তিই তাঁদের কাম্য। গোবিন্দ দাসের কাব্যে যে-বিরহ-বেদনার রোমন্থন আছে, তা তাঁর স্ত্রীবিয়োগেরই শোককাতরতা। কিন্তু এ শুধু যে কবির শূন্য হৃদয়ের আর্তনাদ তা নয়, তাঁর বেদনার স্বরূপ—

১ আমার ভালবাসা। গোবিন্দচয়নিকা
২ ঐ

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ
আমিও নারীর রূপে
আমিও মাংসের স্তূপে,
কামনার কমনীয় কেলিকালীদহ।[১]

এই যুগে দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস প্রমুখ কবিগণ দেহবাদের প্রাধান্য দিয়ে বাংলা প্রেমকাব্যে নূতন সম্ভাবনা জাগিয়েছেন। এই দেহবাদ পরবর্তীকালে মোহিতলালের প্রেরণা যুগিয়েছে এবং তাঁর কাব্যে পুষ্টিলাভ করেছে।

মধুসূদন ও বঙ্কিম -সাহিত্যে প্রেম মূলত যেমন দেহজ বাসনা ব'লেই স্বীকৃত, এই যুগের কাব্যেও প্রেম ভোগারতির স্বীকৃতি। তবে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাতে প্রেমস্বপ্নের স্বাদ যে আলাদা তা আমরা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রকল্পনায় প্রেম মূলত মানসিক ব্যাপার। এই হ'ল গোড়াকার পার্থক্য। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের ভাবনার যে গগনবিহারী বিস্তার তার মূল বিজড়িত মর্মে। এই মানসসাধনারই অস্ফুট কাকলি শোনা গিয়েছিল বিহারীলালে— যদিও তিনি তাঁর প্রেমকাব্যে এই মননশীলতার, জ্ঞান-চেতনার শিল্পসম্মত সুসংহত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

১ আমার ভালবাসা। গোবিন্দচয়নিকা

৩ ॥ প্রেম-সম্পর্কে রবীন্দ্র-আদর্শের স্বরূপ

আদি যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানবজীবনের যে-লীলা চলছে তার মূল সুরটা এক, এই এক থেকেই রূপায়িত হচ্ছে প্রতি ব্যক্তির, প্রতি যুগের জীবন— তার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব-সাহিত্যে প্রেম নিয়ে কত বাখানিই রচিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু এই প্রেমেরও রয়েছে একটা অনন্য রূপ। দেশে-দেশে কালে-কালে মানুষের সমাজের রীতিনীতি, শিক্ষা-সংস্কার কত পরিবর্তিত হ'য়ে যায়, কিন্তু তার হাসিকান্নার আদিম রূপ বদলায় না— এই যে চিরকালীন মানবমনের সুগভীর ঐক্য, তারই স্পর্শ পাওয়া যায় মহৎ শিল্পীর সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানবপ্রকৃতির সেই বিশ্বজনীন স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে স্বদেশ ও স্বকালের পরিধি ছাপিয়ে।

মধ্যযুগে এবং রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত-পূর্ব অধ্যায়ে বাংলার সারস্বতসাধনায় প্রেমের যে-রূপটি ফুটে উঠেছিল তার আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি— উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের মহাসত্র নবজীবনের উৎসবে মুখরিত। এই নবজীবনের— মর্ত্য-লোকে মর্ত্যপ্রেমের— জয়গান উচ্চারিত হয়েছে এই শতাব্দীরই উষালগ্নে বন্ধনমুক্ত বলিষ্ঠ পুরুষ মধুসূদনের কম্বুকণ্ঠে।

নব-উজ্জীবিত বাংলাসাহিত্য ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির দ্বন্দ্বসঞ্জাত। বস্তুত একালের সাহিত্যের প্রেমস্বপ্নও পাশ্চাত্ত্য ভাবনা-ধারণার প্রেরণায় অনুরঞ্জিত। মধুসূদন-বঙ্কিম-বিহারীলালের উত্তর-সারথি রবীন্দ্রনাথে এই প্রেমসাধনা প্রজ্ঞায় অম্লান। মানুষের মর্মকোষে যে রহস্যগভীর আন্তর-ব্যঞ্জনা সংগুপ্ত তারই অমিত মাধুর্য, অমল কান্তি, প্রসন্ন ঔদার্য শিল্পঋদ্ধি লাভ করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। একদিকে সৃজনধর্মী মানসিকতা আর একদিকে নির্দিষ্ট বন্ধনে সীমায়িত সামাজিক জীবনের জটিলতা, সংসার-সম্পর্কের নিবিড়তা— এই দ্বৈত তত্ত্ব, এরই আকর্ষণ-বিকর্ষণ বিবর্তিত হয়েছে বারংবার। কোনো সুনিয়ন্ত্রিত রীতি-পদ্ধতির মধ্যে মানুষের অন্তরকে বেঁধে রাখা যায় না। কবিও কোনো সুনির্দিষ্ট মতামতের মধ্যে প্রেমাদর্শকে ছু'কে দেন নি। পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের দিক থেকে বিচার ক'রে বলেছি রবীন্দ্রপ্রেম বৈষ্ণব-প্রেমাদর্শের দোসর। আবার রবীন্দ্রসৃষ্টিতে কালিদাসের সমধর্মিতাও বর্তমান। মধুসূদন-বঙ্কিম-বিহারীলাল— এই পূর্বসূরীদের প্রেমস্বপ্নও রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের সঙ্গে তাঁদের কেবল সাদৃশ্যই আছে— পার্থক্যও যে অনেক সে-কথা বলাই বাহুল্য।

ভালোবাসার রংমহলে মস্ত বড়ো দুটো ভাগ— একটা ভাবের দিক, আর-একটা দেহতৃষ্ণার। এই ভাবটিই প্রাণময় হ'য়ে উঠেছে বিশেষভাবে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে; রসসার্থকতার স্তরে-স্তরে স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে মানসপ্রেম-সত্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যঞ্জনায়। রবীন্দ্রনাথ মানবপ্রকৃতির দেহকামনার অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করেন নি। কারণ এই সহজাত শাশ্বত আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু উন্মত্ত তৃষ্ণার্ত আদিমতার রূপায়ণে রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা দেখা যায়।

তাই তিনি প্রেমকে জৈবপ্রকৃতির খরস্রোতে সমস্যাসংকুল আবর্তে নিমজ্জিত ক'রে বিভ্রান্ত হ'তে দিতে নারাজ—এর উর্ধ্বে উঠবার যে অদম্য শুভ বাসনা আছে মানুষের, প্রাণরস যেন তাতেই পুষ্ট হ'য়ে প্রেমপদ্ম-কোরকটিকে বিকশিত করতে পারে, এই চেয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের গভীর প্রত্যয় দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনসাধন। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমে অনন্ত বুভুক্ষা ও অতৃপ্তির মর্মজ্বালা নেই। প্রেমেও তাঁর বিবিক্ত ভাব। একমাত্র "কড়ি ও কোমল"-এর আশ্লেষবাসনাময় কবিতা ব্যতীত তাঁর প্রেমের কবিতাতেও তাঁকে দেখি স্রষ্টা ও দ্রষ্টা রূপে, ভোক্তারূপে নয়। এই কারণেই রবীন্দ্রপ্রেমের প্রকাশে আসক্তির তীব্রতা মন্দীভূত। দুর্মদ প্রেমের ঝোড়ো হাওয়া প্রবল হ'তে দেখা যায় নি রবীন্দ্র-সাহিত্যে কোথাও, শেষের দিকে দু-একটি গল্প ছাড়া উপন্যাস-গুলির কাহিনীতেও নয়। ধ্যানের প্রগাঢ়তা ও বিমুক্ত হৃদয়ের উপলব্ধিরূপেই পুরুষ-নারীর প্রেমকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেম—তার উপলব্ধি বিকাশ শুধুমাত্র ক্ষণিকের আত্মরতি নয়, রীতিমতো সাধনার বস্তু। দুঃখকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কল্পনা করেন নি। তাই তাঁর প্রেমের দেবতা স্বভাবসন্ন্যাসী।

বিভিন্ন সময়ে রচিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে প্রেম-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা।… অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।[১]

যৌবনলগ্নে যে-ভাবপ্রেরণা প্রেমসাধনার মন্ত্র কবিচিত্তে

১ মনের বাগানবাড়ি। রবীন্দ্ররচনা। অচলিত সংগ্রহ

জেগেছিল তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই পরিণত রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বে।

বাঙলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে ভালো লাগা আর ভালোবাসা।...আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালো লাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালো লাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।...কারো 'পরে আমাদের অনুভব যখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে, ভালো-ভাবায় ভালো-ইচ্ছায় মন কানায় কানায় ভরতি হয় তখন তাকেই বলি ভালোবাসা। পূর্ণ উৎকর্ষের ভাবকে বলা যায় ভালো। স্বাস্থ্য যেমন প্রাণের পূর্ণতা, ভালোবাসা তেমনি অনুভূতির পূর্ণতা।...ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক, সে হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের পরম প্রকাশ।...বিশ্ব আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে গ্রহণ ও ধারণ করে, মানুষের অন্তরে এই মস্ত সত্যটির অনুভব হচ্ছে প্রেম।...মানুষের সমাজে প্রেম তেমনি সব জায়গাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখে। ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মূল্য মহিমার মূল্য।[১]

বাঙালীর সারস্বতসাধনায় রবীন্দ্রনাথ হলেন প্রথম ঋত্বিক যিনি প্রাকৃত জীবনের প্রেমকে প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন। মানুষেরই কামসংস্কারমুক্ত পরিশুদ্ধ চেতনা, অপ্রাকৃত কল্পলোকে নয়, এই মরজীবনের হাসিকান্নায়, ত্যাগদুঃখে প্রত্যক্ষীভূত হ'য়ে উঠেছে রবীন্দ্র-প্রেমসাধনায়। নরনারীর প্রেমকে তিনি এত উচ্চগ্রামে বেঁধেছেন এবং ব্যাপক পটভূমিতে স্থাপন করেছেন যে, মর্ত্যমানুষের বাণীই অমর্ত্যবাণী হ'য়ে ক্ষণে-ক্ষণে মানুষী সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। বাঙালীর রোমান্টিক প্রেমের প্রথম স্বপ্নসঙ্গিনী শ্রীরাধা, অপ্রাকৃত লাবণ্যময়ী প্রেমিকা, মানবীয় সত্তায় ধরা দিয়েছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে। আর তাই আশ্লেষ-

১ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। যাত্রী

বাসনা, স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষা ধাপে-ধাপে শেষ পর্যন্ত বন্ধনবিমুক্ত জীবসত্তার ভাবের আকৃতিরূপেই অনির্বচনীয় রসধারায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল অনিবার্য দূরত্ব, আশ্চর্য সংযম ও নিরাসক্তি। কিন্তু যেহেতু তিনিও সংসারের মানুষ সেই হেতু বার-বার তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়েছে সমাজের দিকে, সংসারের সাধারণ জীবনলীলার দিকে। শুধু মনোরাজ্যেই তাঁর প্রেমের উত্থানপতন শেষ হয় নি— সামাজিক বন্ধন এবং তার পরিণামী সমাপ্তিতে দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। এইখানেই রবীন্দ্রকল্পনা কালিদাসের বিশিষ্ট প্রেমকল্পনার সমধর্মী। বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রেমতত্ত্ববিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ এর যৌক্তিকতা বিচার করেছেন। প্রণয় পরিণয়ে, গৃহবন্ধনে ও সন্তানজন্মে সার্থক— এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর বহু রচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

মানুষ সমাজ-শাসিত জাগ্রতচৈতন্য জীব। ব্যক্তিমানুষের বুদ্ধি এবং বোধ আত্মসচেতনতা ও জগৎসচেতনতার যোগে উদ্দীপিত হ'লেই প্রেমে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকাশ পায়। সমগ্র সামাজিক সত্তা নিয়েই মানুষের প্রেম স্বাভাবিক এবং সার্থক। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে জীবননিরপেক্ষভাবে দেখেন নি, জীবন থেকে বড়ো ব'লেও মনে করেন নি। মানবজীবনের পরিপূর্ণ সংগতি ও সুষমার অভিব্যক্তিই প্রেম। জীবনকে তা পূর্ণতার স্বাদ দেয়, সুতরাং প্রেমে ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবীরূপেই স্বীকার্য। অবয়বসাদৃশ্যে, মানবিকতায় ব্যক্তি যেমন মানবগোষ্ঠীর প্রতিভূ, আবার প্রত্যেক ব্যক্তিই তেমনি বিশিষ্ট চেহারার ছাঁদে বিশিষ্ট মানসিকতায় স্বতন্ত্র। সেইরকম ব্যক্তির হৃদয়ে যদিও প্রেমের জন্ম আর-একটি হৃদয়কে অবলম্বন ক'রে, কিন্তু তার বিকাশ

এবং প্রকাশের সঙ্গে জড়িত আছে বিচিত্র কর্তব্য ও দায়িত্বের যোগ। বস্তুত আত্মকেন্দ্রিকতা ও শুধুমাত্র দেহানুগত্যের পথে সংকীর্ণ হ'য়ে থাকলে সে-প্রেমে কোনোদিনই সার্থকতা আসতে পারে না। "রাজা ও রানী"র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

ঠিক এই সুরেরই প্রতিধ্বনি প্রথম দিকে এবং শেষের দিকে রচিত দুটি প্রবন্ধে আছে।

যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; সেই জন্যই সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।[১]

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে বলেছেন—

প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে।

সুতরাং এখানে আমরা রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, মানুষের প্রেম সমাজনিরপেক্ষ শুদ্ধসত্তার বিকাশমাত্র নয়। প্রেমের প্রকাশ ও পূর্ণতা সংসারেই, এবং এই প্রেম গৃহত্যাগী নয়, বিবাহবন্ধনে ও সন্তানজন্মে তা সার্থক। তাই তিনি বলেছেন—

বন্ধনে যথার্থ শ্রী···। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের চরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নরনারীর প্রেম সুন্দর নহে, স্থায়ী নহে যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সংকীর্ণ হইয়া থাকে— কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। প্রাচীন সাহিত্য

পুত্রকন্যা অতিথি প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।[১]

মানুষের সংরক্ত শাশ্বত আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন করবার উপায় নেই। তা হ'লে সৃষ্টির মূল রহস্যকেই অস্বীকার করতে হয়। তা ছাড়া জৈবধর্মের স্বাভাবিকত্বে কৃত্রিম অনীহা দেখানোরই বা প্রয়োজন কি? মানুষের জীবনে জৈবধর্ম প্রকাশেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং তা জীবনের পরিপূরক। রবীন্দ্রপ্রেমের এই সবল সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বাধিকারী পরিণতিকামী রূপটিই কালিদাসের প্রেমধর্মের সগোত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই প্রেমও ভোগারতি মাত্র নয়। কালিদাসের প্রেমাদর্শে ভোগতান্ত্রিকতাই বড়ো নয়, ভোগ পরিশুদ্ধ হয়েছে দুঃখের আগুনে। এবং এই মহৎ নীতি আছে ব'লেই তিনি মহাকবি। এই দুঃখ ও ত্যাগের তপস্যাশুদ্ধ প্রেম রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে, যেমন করেছে বৈষ্ণবকাব্যের দুঃখবাদের তপস্যা। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত তাঁর দুটি প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

শকুন্তলা আতিথ্যধর্ম পালন করতে ভুলে গেলেন, তার কারণ প্রকৃতি যখন আপন উদ্দেশ্য সাধনে লাগে তখন সমাজের উদ্দেশ্যকে খাটো করে দেয়। এইখানে বাধল জৈবধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ। রাজসভায় শকুন্তলার প্রেমের উপর অপমানের বজ্র এসে পড়ল…। …প্রকৃতি যখন প্রেমের সারথ্য নেয় তখন সে প্রবৃত্তির জোয়ালে তাকে বাঁধে। কিন্তু ধর্ম যখন তার চালক হয় তখন সে প্রেম মুক্ত রূপে প্রকাশ পায়। নিবৃত্তি-শান্ত আত্মত্যাগরত প্রেমের সেই অচঞ্চল মুক্ত স্বরূপই পরম সুন্দর।[২]

১ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা। প্রাচীন সাহিত্য

২ ভারতবর্ষীয় বিবাহ। সমাজ

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে কালিদাসের প্রেমতত্ত্ব-বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

ধর্ম যেখানে দুই হৃদয়কে একত্র করে সেখানে মদনের সহিত কাহারও কোন বিরোধ নাই। সে যখন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাধাইতে চায় তখনই বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই প্রেমের মধ্যে ধ্রুবত্ব এবং সৌন্দর্যের মধ্যে শান্তি থাকে না। কিন্তু ধর্মের অধীনে তাহার যে নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গস্বরূপ, সেখানে থাকিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে না।

এই প্রবন্ধেই অন্যত্র বলছেন—

…নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূত নির্মল যোগাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।…যে প্রেমের কোন বন্ধন নাই কোন নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথও করেন নি। রবীন্দ্রনাথ দেহলাবণ্যকে, রূপকে স্বীকার করেছেন, কারণ তিনি সৌন্দর্যপিপাসু কবি; কিন্তু প্রেমকে তিনি ইন্দ্রিয়বিলাসের সামগ্রী মনে করেন নি। কালিদাসের কাব্য সমালোচনাকালে বার-বার মহাকবির কাব্যে দুঃখবাদের তপস্যার কথা বলেছেন তিনি। এই দুঃখবাদের তপস্যা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তি শুনেছি—

বসন্তসখা পঞ্চশর মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন।

—সেই ত্যাগশুদ্ধ প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা শোনা যায় শান্তিনিকেতন উপদেশমালার 'প্রেম' প্রবন্ধে—

'ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায় না।

প্রবৃত্তির দাবদাহ নয়, দেহজ রূপের প্রতি উন্মত্ত আসক্তিই একমাত্র সত্য নয়, নিবৃত্তিশান্ত হৃদয়ের সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বড়ো ব'লে জেনেছেন। কেবলমাত্র প্রবন্ধে নয়, কাব্যে গানে এবং অন্যান্য অসংখ্য রচনায় তাঁর এই অভিমত সুস্পষ্ট।

কালিদাসের শকুন্তলা সুতীব্র অপমানের পরেও দুষ্মন্তের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যও ত্যাগ ও ক্ষমার আদর্শে মহনীয়।

…ভালবাসায় মার্জনা এবং দুঃখস্বীকারে যে সুখ, ইচ্ছা পূরণ ও আত্মপরিতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।'[১]

কবির এই উপলব্ধি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে রসমূর্তি পেয়েছে। কচ, নিখিলেশ, শর্মিলা— এদের জীবনের বেদনা ক্ষমারই রূপ ধ'রে তাদের মহৎ করেছে। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেই প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের বলিষ্ঠ পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার বস্তুরূপেই প্রেম রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিব্যক্ত, ইন্দ্রিয় সেখানে আত্মাকে উন্মুক্ত করার রন্ধ্রপথ। তিনি দেহবাদের নিষ্ফলতাকে বড়ো ক'রে প্রেমকে জ্বালাময় ক'রে তোলেন নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিক অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রেম-দর্শনে বাসনার 'আগ্নেয় আতিশয্য' নেই।

পুরুষ এবং নারী কারো উপরেই রবীন্দ্রনাথের আস্থা কম নয়। নারীর বিচিত্র রূপের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তার কল্যাণী রূপকেই তিনি শেষ পর্যন্ত বন্দনা করেছেন :

'নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে ; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর

১ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড

তুলনা নেই। পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়; নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো; এই দুয়ের যোগে পরস্পরের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর প্রেমে আর এক সুরও বাজতে পারে মদনধনুর জ্যায়ের টংকার— সে মুক্তির সুর না বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়।'[১]

রবীন্দ্রনাথের অভিমত নারীকে নারীত্ব, স্ত্রীত্ব, মাতৃত্বের পূর্ণ অধিকার নিয়েই তার স্বতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক হ'তে হবে এবং সে-সৃষ্টির ক্ষেত্র সংসার। কেননা—

'ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক।'[২]

কিন্তু বন্ধন সব সময়েই শিকল হ'য়ে বাজে এমন নয়। কারণ—

'যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এ মুক্তি বড়।'[৩]

নারীপ্রকৃতিতে নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আর তারই উপরে রয়েছে জীবপালনের ভার। সেইজন্যই তার প্রেমে, তার প্রকৃতিতে সহজাত সেবা ও শুশ্রূষার ভার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এই পর্যন্ত দেখা গেল ধর্মবন্ধন ও কল্যাণমুখিনতাই রবীন্দ্র-প্রেমের আদর্শ; দেখা গেল কালিদাসের প্রেমাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রেমের সাদৃশ্য। কিন্তু এহ বাহ্য। এর পরে আরও আছে।

১ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। যাত্রী

২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। সমাজ

৩ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। যাত্রী

আদর্শের দিক থেকে এবং তত্ত্ববিশ্লেষণে প্রেমের মঙ্গল পরিণাম ও কল্যাণময় রূপকে প্রাধান্য দিলেও এই গৃহবন্ধন ও বন্ধনাতিরিক্ত অবিমিশ্র মাধুর্যের ধারণায় রবীন্দ্রমানসে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এ দুয়ের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকবে অথবা পরস্পরের মিলন সম্ভব হবে— বার-বার এ-প্রশ্ন জেগেছে রবীন্দ্ররূপসৃষ্টিতে। তাঁর এই মানস-দ্বন্দ্ব প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে ব্যক্ত করেছেন—

আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।[১]

সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন -পূর্ণ খণ্ড সংসারে আবদ্ধ প্রেম আর প্রেমের সীমাহীন রূপ— রবীন্দ্রসৃষ্টিতে এ দুয়েরই আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা বর্তমান। প্রেমে বন্ধন এবং অ-বন্ধন দুয়েরই সমমর্যাদা আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। গৃহবন্ধনে সমাপ্ত এবং বন্ধনাতিরিক্ত প্রেম সমার্থক নয়। প্রেমের এই দ্বৈত রূপের বিচিত্র লীলা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপরিস্ফুট। কখনো এ দুয়ের সমন্বয় কখনো এ দুই দুই কোটিতে মুক্তবেণী। মানুষেরই প্রেমে রয়েছে একদিকে বন্ধনে প্রবল আসক্তি আর একদিকে বন্ধনমুক্তির দুর্জয় বাসনা— এ দুয়ের নিরন্তর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বজাত ঐশী বেদনাই রবীন্দ্র-প্রেমের মর্মকথা। স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌবনের দেহসম্ভোগ মানুষের চিত্তে অবসাদ জাগায় আর তা থেকে বিবশ চিত্ত মুক্তি চায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম শুধুমাত্র জৈব কামনার আকর্ষণে বিচলিত হ'য়ে সংসারসীমায় সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ হয় নি। একটি মহৎ দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ও মলিনতার ঊর্ধ্বে বিশ্বজনীন এবং চিরকালীন জ্যোতিতে তা জ্যোতিষ্মান।

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ও চরম আস্থা। ব্যক্তি-প্রেমেই অসীম প্রত্যাশা। ভোগাসক্তি উত্তীর্ণ হবে মানুষের প্রেম। কারণ ভালোবাসার পূর্ণতা আত্মিক মিলনে। তাঁর কাছে

মানুষের আত্মার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই…।[১]

জীবনের বিকাশের প্রয়োজনে প্রেম অপরিহার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম মূলত মানসিক ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হ'লেও মানুষের কাম-সংস্কার, তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় নি। প্রণয় একদিকে পরিণয়ে মাতৃত্বে সমাপ্ত, আর-একদিকে প্রেমে বন্ধনহীন ব্যাপ্তি। এ দুয়ের কখনো সমন্বয়, কখনো স্বাতন্ত্র্য যুগ-পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে বহু বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসাকে জীবনে বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছেন এবং ভোগতান্ত্রিকতা রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে অতিক্রান্ত ব'লেই তার সুষ্ঠু বিন্যাস ও বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে। সৃজনধর্মে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল ব'লেই কোনো একটিকে তিনি চূড়ান্ত ব'লে ঘোষণা করেন নি, বরং জীবনের বিচিত্র প্রকাশ ও পরিবর্তনকে শ্রদ্ধা করেছেন। রবীন্দ্রপ্রেমের এই মুক্তিবন্দনা ও গগনপ্রসারী দৃষ্টি আমাদের অনুভূতির মর্মমূলে নাড়া দেয়। প্রেমের মুক্তিঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি নারীকেও পরিপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এ-প্রেমে কেবল গৃহ নয়, কুমারসম্ভবের ইঙ্গিত নয়— আনন্দই এর পরম লক্ষ্য ও পরম প্রাপ্তি। এ-প্রেম মৃত্যুঞ্জয়। জীবনের চলিষ্ণুতার সঙ্গে, মানুষের পরিবর্তনশীল মনের সঙ্গে তার গতিকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। মরদেহধারী নরনারীর এই প্রেম আত্মসমীক্ষারই নামান্তর— আত্মলোকে তার চিৎদৃষ্টিলাভ।

১ চিঠিপত্র ১ম খণ্ড

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের দ্বৈত লীলায় হৃদয় তার নিজস্ব পথে আপন গতিতে চলেছে এগিয়ে, আর-একদিকে তা সংসারসীমায় খণ্ড সুখদুঃখে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো কবির কাব্যে ব্যক্তিপ্রেমিকা সংসারবন্ধনবিমুক্ত বিশ্বরমার রসমূর্তিতে রূপায়িত হয় নি। প্রেমের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'রচি শুধু অসীমের সীমা'। মানবীতেই বিশ্ব-মানসীত্ব আরোপ অথবা মানসীকে মানবীর মধ্যে খুঁজে পাবার বাসনাই অভিনব রবীন্দ্র-প্রেমধর্মের অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ। প্রেমের এই সাধনায় নারী-মাধুর্যের ও সর্বসংস্কারমুক্ত মনুষ্যত্বের মহিমান্বিত রূপ রবীন্দ্রসাহিত্যে ফুটে উঠেছে। নারীপ্রকৃতির বৃন্তবিধৃত দুটি সত্তা— প্রিয়া-সত্তা ও মাতৃ-সত্তা। প্রিয়া-রূপে তার এক পরিচয়, মাতা-রূপে তার অন্য পরিচয়, আর তৃতীয় পরিচয় নারী-রূপে।

নারীর দ্বৈত সত্তার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

…নারীর দুটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে…মানবসংসারে তা পাপকে, অভাব অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে।[১]

এই দুটি সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ একই মানবীতে একই কালে সংসারে বিরল। নারীস্বভাবের এই অলক্ষিত মাধুর্যের বিকাশ বোধ হয় একব্যক্তিকেন্দ্রিকও হ'তে পারে না। এই অলক্ষিত মাধুর্য পুরুষের পক্ষে অপরিহার্য। কেননা—

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।[২]

১ ভারতবর্ষীয় বিবাহ। সমাজ

২ পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি। যাত্রী

প্রেমের ক্ষেত্রে এই দুই প্রেরণার সক্রিয় ও সাবলীল মাধুর্যের স্বরূপনির্ণয়ে নারীর দ্বৈতসত্তার কখনো মিলন, কখনো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। পরিশেষে প্রেয়সী ও কল্যাণীকে অতিক্রম ক'রে প্রজ্ঞাপরিশীলিত পূর্ণ-মনুষ্যত্বের মহিমায় মহীয়সী নারীর একটি তৃতীয় রূপ রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। এ-নারীকে তিনি সেবাকক্ষে আহ্বান করেন নি। সেই দীপ্তিময়ী ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর প্রেম শোকবিমূঢ় হ'য়ে থেমে থাকে নি রঞ্জনের মৃত্যুতে— গ্রহণ করেছে রাজাকে। সে-প্রেম শুধু কল্যাণের শুভ-দীপ্তিতে কমনীয় নয়— বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে ও প্রখর মননশীলতায় হীরকপ্রভ আত্ম-জাগৃতি। মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ পরিচয় ব্যতীত নারীর যে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও চিরন্তন প্রেমিকার রূপ আছে রবীন্দ্রপ্রেমসৃষ্টিতে সেই সত্তার উজ্জ্বল অভিব্যক্তি দেখা যায়। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

মেয়েকে পূর্ণ শক্তিতে আজ মেয়ে হতে গেলে তার সমস্ত মানবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক।[১]

আমাদের সমাজে নারীর এই স্বতন্ত্র সত্তাটি প্রেমের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ছিলই না, বরং নিন্দিতই হয়েছে এবং রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা-সাহিত্যেও তা পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্থান পায় নি। 'নারীর মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ-কথাও স্পষ্টভাবেই বলেছেন—

…আমাদের দেশেও কৃত্রিমবন্ধনমুক্ত মেয়েরা যখন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষ পাবে আপন পূর্ণতা।

রবীন্দ্রপ্রেমের আদর্শ আমাদের সমাজে বা ব্যক্তিমনে প্রেমের ধারণাকে উচ্চতর ভাবলোকে উন্নীত বা রূপান্তরিত করতে

১ নারীর মনুষ্যত্ব। সমাজ

পেরেছে কিনা এ-জিজ্ঞাসা তাত্ত্বিকের মনে জাগতে পারে। সামাজিক নজির দিয়ে কূটতার্কিক তার বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু রসিক মাত্রেই জানেন এ-জিজ্ঞাসার সমাধানের উপরেই রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের সার্থকতা নির্ভর করে না। আদর্শ চিরদিনই আদর্শ। রবীন্দ্র-প্রেমসাধনায় আছে অনন্ত মাধুর্য— রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ; 'পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময়' সে-প্রেমের আনন্দ-উপলব্ধি— দেহে ও দেহাতীতে অপূর্ব সমন্বয়।

সেই আদর্শে সকলে অনুপ্রাণিত হ'ল কি না, এই ভাবরস উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ল কি না, সেটাই সামাজিক ও সাংসারিক খতিয়ানে খতিয়ে দেখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন নয়, কারণ তা নির্ভর করে ব্যক্তি-অভিরুচি এবং স্বভাবের উপরে। রসিক-চিত্তেই এই প্রেম রসমোক্ষ লাভ করে। রবীন্দ্রপ্রেম উপলব্ধির যোগ্য চিত্তভূমি প্রস্তুত হ'লেই দেহ ও দেহাতীতের দ্বন্দ্বজাত ঐশ বেদনা আর সেই বেদনার পরমপ্রাপ্তি সংস্কারমুক্ত প্রত্যয়ে প্রতীতি জন্মায়। মানুষের চেতনায় অহরহ ভালো আর মন্দের যে-দ্বন্দ্ব চলেছে তার সাগরমন্থনে যা উত্থিত হয় তা অমৃত হ'লেই ভালো। মানুষের মনে জৈবশক্তির নাগপাশ ছিন্ন ক'রে কাম-সংস্কারমুক্ত পরিশুদ্ধ চেতনাকে জাগ্রত করবার স্পৃহা বর্তমান— তাই মানবেই আরোপিত হয় দেবত্ব, ক্ষণে-ক্ষণে তার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। যদিও সহজাত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, তবু মানুষ অন্ধপ্রবৃত্তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র নয়, সে চৈতন্যের আলোক-বিহঙ্গ, নভোচারী।

৪ ॥ রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য

. . . .

রবীন্দ্রপ্রেমের ভাবনা-ধারণা কৈশোর যৌবন ও পরিণত বয়সের অনুভূতি ও মননে সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-প্রেমের আদর্শ প্রসঙ্গে যে-আলোচনা করা হয়েছে তারই উপর ভিত্তি ক'রে রবীন্দ্রসাহিত্যে স্তর-পরম্পরায় যে-যে বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক।

স্বল্প ব্যবধানে বা একই সময়ে রচিত প্রবন্ধ কাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদি একত্রে স্তরে-স্তরে উল্লেখ করলেই কালানুক্রমিক রবীন্দ্রমানসে প্রেমের বিচিত্র এবং বিশিষ্ট ধারণার মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে।

রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক— বিবাহবন্ধন-নিরপেক্ষ ও বিবাহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব। প্রেম হৃদয়ের সীমাহীন ভাব, তার পরিণতি যখনই বিবাহে অনিবার্য হ'য়ে ওঠে তখনই সে-ভাব একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এতেই সৃজনধর্মী প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতা কি না— এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন দিক থেকে বিচিত্রভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। "বনফুল" কাব্যেই এর বীজ আছে। স্বতন্ত্র বিভাগ করা না গেলেও স্থূল বিচারে বলা যেতে পারে যে, "গোরা" পর্যন্ত রবীন্দ্র-

প্রেমসাহিত্যে পূর্বরাগের পরিণতি হয়েছে বিবাহে— প্রিয়া ও জায়ার সমন্বয়সাধনে। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল 'নষ্টনীড়' ও "চোখের বালি"তে। "গোরা"-পরবর্তী রচনায় এই জটিলতা ও দ্বন্দ্ব এবং বন্ধন-নিরপেক্ষ প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ।

"কড়ি ও কোমল"-এর যুগে কবি 'জীবন নিকেতনে রহস্য সভায়' আসন পেতেছেন, 'জীবন্ত হৃদয়মাঝে' স্থান চেয়েছেন। তাই এ-পর্বে প্রেমে যৌবনের বিচিত্র স্বপ্নসাধ জেগেছে দেহকে ঘিরে। জীবন সত্য, তাই মিলননাট্য জীবনরঙ্গভূমিতে সার্থক। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা আসে নি মিলনে— মিলন ও বিরহের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। দেহসম্ভোগের মধ্যেই রয়েছে সম্ভোগবিরতির বাসনা। "কড়ি ও কোমল"-এ যে-আভাস দেখা দিয়েছিল তারই পরিণত রূপ "মানসী" কাব্য।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯০এর মধ্যে রচিত কাব্য, গীতিনাট্য, নাট্য-কাব্য প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্রপ্রেমের দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। "রাজা ও রানী" নাট্যকাব্যে প্রেমের একটি অভিনব রূপ দেখা দিল। প্রবল আসক্তির দ্বন্দ্বে নারীর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও মহনীয় ব্যক্তিত্বের সূচনা— এখান থেকেই দ্বৈতবাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বহুপরবর্তী "পলাতকা", "পূরবী", "শেষের কবিতা", "মহুয়া" প্রভৃতিতে নারীর মনুষ্যত্বের যে পূর্ণ স্বীকৃতি আছে তারই সূচনা যেন সুমিত্রা চরিত্র। এই সময় কবির মনে দ্বিধা জেগেছে— নারীর পূর্ণ পরিচয় কিসে? প্রেয়সীত্ব বা মাতৃত্ব এই দুই মুখ্য পরিচয়ে? অথবা নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে, উজ্জ্বলতর সত্তায় জাগ্রত হ'তে হবে? নারীমহিমার এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে চিত্রাঙ্গদা, সুমিত্রা, দেবযানী, সুচরিতা, ললিতা, লাবণ্য, কুমুদিনী, নন্দিনী, সোহিনীর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতে।

১৮৯১ থেকে ১৮৯৮-এর মধ্যে প্রকাশিত অনেকগুলি ছোট-গল্প, "চিত্রাঙ্গদা" নাট্যকাব্য, "সোনার তরী" ও "চিত্রা" কাব্য এবং "চৈতালি"র বিভিন্ন কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ক'রে 'পতিতা' ও 'পরিশোধ' কবিতা দুটির মধ্যে যে-স্বীকৃতি আছে, শেষ পর্বের উপন্যাস কয়েকখানিতে, "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে এবং "তিনসঙ্গী"র মধ্যে তার সংহত রূপ দেখা যায়। এই সময়ে রচিত কয়েকটি ছোটগল্পেও প্রেমে মধুর রসের ব্যঞ্জনায় বাৎসল্যের মিশ্রণ দেখা যায় বালিকা-বধূ পরিকল্পনায়।

'মানববুভুক্ষার আদিম প্রেরণা' রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে অন্ধ ধমনীর স্থূলত্ব নিয়ে নয়, আঘাতে অভিঘাতে তাকে তিনি জারিয়ে তুলেছেন। "সোনার তরী"তে ব্যক্তিচিত্তের সঙ্গে বিশ্ব-চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিপ্রেম প্রকৃতির পটভূমিতে সংস্থাপিত হ'ল। বিশ্বের বিচিত্র গৌরব মানুষের মধ্যেই বর্তমান এবং এই বহু ও ব্যাপক বৈচিত্র্যই মানুষকে বড়ো করেছে। মন আছে ব'লেই মানুষ কামপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম ক'রে মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে। "চিত্রা" কাব্যই মহিমাময় প্রেমের প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৯০০ থেকে ১৯১২র মধ্যে এ-দৃষ্টান্ত অজস্র ও উজ্জ্বল হ'ল "চৈতালি", "ক্ষণিকা", "চোখের বালি", "গোরা", "বিদায় অভিশাপ", "মালিনী", 'নষ্টনীড়' এবং কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—বিশেষ ক'রে "বিচিত্র প্রবন্ধ", "প্রাচীন সাহিত্য" ও "সমাজ" ইত্যাদি রচনায়। প্রবন্ধগুলিতে প্রেমতত্ত্বের যে-ব্যাখ্যা আছে তা রবীন্দ্রনাথের অভিমত ব'লে গ্রহণ করতে পারি আমরা। আর, কাব্যসমূহে রবীন্দ্রমানসে প্রেমের স্বরূপের এবং উপন্যাসগুলিতে প্রেমের বস্তুরূপের সাক্ষাৎ পাই।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ "বলাকা" ও "পলাতকা"র পর্ব। এই পর্বের প্রেমে যৌবনের ঋজুতা ও বন্ধনমুক্তির সুর বেজে

উঠেছে। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের সমস্যা ও নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতা প্রকাশিত। "রাজা ও রানী" নাট্যকাব্যে সুমিত্রা চরিত্রের যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সূচিত হয়েছে, সেই আত্মপ্রত্যয়প্রবুদ্ধ নারীর মহীয়সী মূর্তি দেখা দিল "পলাতকা"য়। ইতিমধ্যে বিনোদিনী, বিমলা, দামিনীর মধ্য দিয়ে বিচিত্র সম্ভাবনা মুখর হ'য়ে উঠেছে।

১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে পেলাম "পূরবী", "চিরকুমার সভা", "রক্তকরবী", "যাত্রী", "যোগাযোগ", "শেষের কবিতা", "মহুয়া"। এইটি প্রধানত "পূরবী"-"মহুয়া"র যুগ— মানবমনের বন্ধনবিমুক্ত, কামসংস্কারমুক্ত পরিশুদ্ধ চেতনার উদ্বোধনে এই পর্বের বিশেষত্ব।

১৯৩০-১৯৪১ পর্যন্ত শেষলগ্নেও "দুই বোন", "বাঁশরী", "মালঞ্চ", "চার অধ্যায়", "আকাশপ্রদীপ", "শ্যামা", "তিনসঙ্গী"তে প্রেমের নানা রূপ ও রীতি আমাদের বিস্মিত করেছে। মহৎ স্রষ্টা মানবপ্রকৃতির কোনো অন্তর্নিহিত আবেদনকেই নির্বাসিত করতে পারেন না তাঁর সৃষ্টি থেকে। মুখ্যত এই শেষের কয়েকটি রচনায় মানবের সংরক্ত ভোগবাসনার তীব্রতা প্রাধান্য পেয়েছে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিচিত্র পরিবেশে দ্বন্দ্বসমস্যাজড়িত প্রেমের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই সবিশেষ সুস্পষ্ট। এখানে মানুষের সামাজিক চরিত্ররূপ এবং দেহ ও মনের সংগতিময় সামঞ্জস্যবিধানে সচেষ্ট তিনি। চলমান জীবনের গতি ও পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে প্রেমের সহজ সংগতিরক্ষার প্রয়াস এবং মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির অনুরণন উপন্যাসেও লক্ষণীয়। কাব্যে স্বভাবতই প্রেমের রূপ বিশেষভাবে ভাবরূপ, ভাবের আকৃতিরূপেই তার প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সাহিত্যে সামাজিক বন্ধনবৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রেম আবদ্ধ ছিল। ‘কিন্তু পরিণত বয়সের রচনায় বন্ধন-বিমুক্ত চেতনারূপেই নারী-পুরুষের ভালোবাসার স্বরূপ উজ্জ্বলতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে মানুষ দেশকালাতীত বিশুদ্ধ মানবরূপেই অভিব্যক্ত, তাই প্রেমও সেখানে নিত্যধর্মরূপেই অভিহিত। সে-প্রেমের দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম কখনো সনাতন সংস্কার, প্রচলিত প্রথা বা ধর্মবিকৃতির বিরুদ্ধে ; কখনো বা স্ত্রী-পুরুষের চিরকালীন অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্যারূপে। বিবাহবন্ধনের পরিণাম, মানবের শাশ্বত কামনার তীব্রতা, আবার এ-সবকে অতিক্রম ক'রে বিমুক্ত হৃদয়ের লীলামাধুর্য— এই ত্রিবেণীসংগমে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। আর নিরবচ্ছিন্ন মিলন নয়, দেহ-বাসনামুগ্ধতা নয়— বিরহবেদনামথিত এই প্রেমই বিচিত্র ও মহৎ। কেননা বিরহই আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটায়, অনুভূতিকে তীব্রতর করে ও আপন স্বরূপকে উপলব্ধি করায়।

কাব্যে

রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের অন্তরঙ্গ স্বরূপটি কাব্যে গানে উপন্যাসে গল্পে নাটকে রসরচনায় বিচিত্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। রূপ থেকে স্বরূপে রূপান্তর, বুদ্ধি থেকে বোধে উত্তরণ, জ্ঞান থেকে ধ্যানে প্রাপ্তি— প্রেমসত্তার অভীষ্ট-সিদ্ধি অতি অপূর্ব ভাবেই রবীন্দ্রকাব্যে বিন্যস্ত হয়েছে।

কৈশোরের “বনফুল” ও “ভগ্নহৃদয়” কাব্যের স্বপ্নাচ্ছন্ন আবেগ প্রকাশকাতর হ'য়ে উঠেছে “সন্ধ্যাসংগীত”-এ। এই পর্বে প্রেম শুধু সন্ধানব্যাকুলতার বিষাদজড়িমা। তারপর, এই সন্ধানসাধনায় বাস্তবজীবনের প্রাপ্তি ও মানসলোকে চির অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্ববেদনা-

মুখর "কড়ি ও কোমল" কাব্য। মানুষের মর্মসংগুপ্ত চিরন্তন বেদনাই "কড়ি ও কোমল" কাব্যের প্রেমের মুখ্য অবলম্বন। যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন-সাধ তরুণ কবির মনকে মাতাল ক'রে তুলেছে। স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌবনের আশ্লেষবাসনাময় সম্ভোগ-মিলনের অকুণ্ঠ প্রকাশ তার তীক্ষ্ণ তীব্র সচেতনতায়। নিরাভরণ সৌন্দর্যের ও নগ্ন দেহকান্তির প্রতি সেই চিরকালীন মোহের ইন্দ্রজালরচনা। কিন্তু বাস্তব-সংসারে এর যে অর্ঘ্য মেলে তাতেই কি মিটে যায় মানব-অন্তরের চির-প্রিয়-পিপাসা? প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হয় প্রেম? না, হয় না। ভোগের অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। আসক্তি থেকেই জন্ম নেয় অনাসক্তি। দেহবাসনা থেকেই চিদ্‌সত্তার অভিসারযাত্রা— মানস-বিহার। তাই কবি কখনো বলেন— 'এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী'; আবার কখনো বলেন— 'এ মোহ কদিন থাকে এ মায়া মিলায়', তাই 'চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।' কিন্তু এই যে ভোগ থেকে চেতনায় পরিশুদ্ধি, তা কি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানীর ভাবতন্ময়তা? সংসার-বিমুখ মুক্তিসাধনা? তা নয়। সে-বাসনা 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়' এবং সেই প্রেমেই মুক্তি আস্বাদন করবার সাধনা।

রবীন্দ্র-প্রেমচর্চার মুখ্য অবলম্বন দুঃখ এবং সেই দুঃখের স্পর্শ লেগেছে "কড়ি ও কোমল" কাব্যের প্রেমে। সংসারে দুঃখের পথে দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ জেগেছে 'মরীচিকা' কবিতায়। বস্তুত "মানসী"র আভাস "কড়ি ও কোমলে"ই আছে। "মানসী"তেই রবীন্দ্র-প্রেমাদর্শের সুস্পষ্ট সূচনা। এরই প্রাজ্ঞ এবং স্থির উপলব্ধির অভিনব শিল্পায়ন শেষ প্রান্তবর্তী "মহুয়া" কাব্যে। রবীন্দ্র-প্রেমসাধনার বিচিত্র গতি ও ক্রমপরিণতি রসসার্থকতার স্তরে-স্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত হয়েছে। মননপরিশীলিত যে-প্রেমের অভিযাত্রা দুর্নিরীক্ষ্য ধ্যানলোকে,

তারই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মিশ্র রাগিণী "মানসী"তে ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রমানসের প্রকৃতিই এমন যে, বিশেষ দেহধারী প্রেমিককে উপলক্ষ্য ক'রে প্রেম সেই বিশেষের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। ব্যক্তিপ্রেমে বিশ্বপ্রেম-রহস্যের আভাস "মানসী"তে সুস্পষ্ট।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।···

দুটি বিশেষ মানুষ উপলক্ষ্য হ'লেও এ-প্রেম নির্বিশেষ প্রেম-স্বরূপে পর্যবসিত, কারণ প্রেমিক-যুগলের প্রেমস্রোতের উৎস হচ্ছে অনাদিকালের হৃদয়। একটিমাত্র উচ্ছলিত যৌবনের প্রেম নয়— এ-প্রেম যুগ-যুগ ধ'রে মানুষকে উন্মনা ক'রে তুলেছে।

"মানসী"র 'একাল ও সেকাল' কবিতাটিতেও একটি বিশেষ প্রেমিকার মধ্যে চিরকালীন প্রণয়িনী বিরাজমান। কবি এখানে প্রেমের বিশিষ্ট রূপ থেকে স্বরূপে উপনীত। কাব্যের উদ্দিষ্ট মানুষটির মধ্যেই নির্বিশেষ মানবস্বরূপটি উপলব্ধি করেছেন এবং প্রেমের বস্তুরূপের ঊর্ধ্বে প্রেম-স্বরূপের প্রতিই অনিঃশেষ আকর্ষণ তাঁর। কবিমানসেরই সেই অনির্দেশ্য আকর্ষণ, কবির মানসবিহার—

আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে··· ।[১]

অন্যত্র বলেছেন—

জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়।[২]

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

২ ছেলেবেলা

এই প্রেমিকা 'বিরহী ভাবনা জাগিয়ে দেয় মাত্র', কবি তাকে আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে গ'ড়ে তোলেন। এই ভাব-বেদনা দ্বারা উদ্বোধিত "মানসী" কাব্য। এখানে—

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর-সব।

হৃদয়-অনুভব, তার প্রেরণাই এ-প্রেমের মুখ্য রূপ।

'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি' এই যুগ্মক কবিতায় এবং 'ভুলভাঙা' ও 'গুপ্তপ্রেম' কবিতা দুটিতে নারী ও পুরুষের প্রেমের দুটি ভিন্ন প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। পুরুষ যখন নারীকে ভালোবাসে তখন তার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আগ্রহ ঢেলে দেয়, প্রিয়াকে কেবলই মনে করে মনোহারিণী। কিন্তু এই স্বপ্নাঞ্জন মুছে যায় যখন তার অনির্বচনীয়ত্ব হ্রাস পেতে থাকে প্রতিদিনের আত্যন্তিক সম্বন্ধের সংস্পর্শে; তার প্রেমের আবেগব্যাকুলতা শ্লথ হ'য়ে পড়ে, ব্যবহারিক হ'য়ে পড়ে— নারীর পক্ষে এ বড়ো মর্মান্তিক। তার অন্বীক্ষা একনিষ্ঠতা। হৃদয়ব্যাকুলতা ও চিত্তের সাগ্রহ আকর্ষণ না থাকলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়? সে বড়ো অপমান, বড়ো যন্ত্রণাদায়ক যখন মালার ফুলগুলি ছিন্ন, অথচ বাহুবন্ধনের প্রয়াস অক্ষুণ্ণ। তাই নারীর উক্তি—

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।

"মানসী"তে যে-ভাবনার সূচনা দেখা গেল, "ক্ষণিকা"র মধ্যেও তা বর্তমান; কিন্তু তার পূর্ণ পরিণত রূপ দেখি "মহুয়া" কাব্যে। আত্যন্তিক বন্ধন নয়, ব্যবধানের মাধুর্য না থাকলে প্রেমের নিঃসীম ভাব-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হ'তে পারে না।

পুরুষ স্বপ্নবিলাসী, সে তার মানসীর অনুসন্ধানে পূর্ণতার

স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় যে-মানবীর মধ্যে, সেখানে হয়তো আসে বিফলতা। রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্বের সেই অসীম পিপাসা ও সসীম প্রাপ্তির দ্বন্দ্বব্যাকুলতা সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত 'পুরুষের উক্তি' কবিতায়—

কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে
রহিলে না ধ্যানধারণার!

প্রেমের এই স্বতঃবিরোধ রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় ব্যক্ত। চির-প্রিয়াপিপাসু পুরুষ-হৃদয় একটি নারীর মধ্যে তৃপ্ত হয় কি না সন্দেহ, যদিও তার নিত্যপ্রয়োজন মিটতে পারে এক মানবীতে। এ-দ্বন্দ্বের অবসান নেই।

আবার নারীও পুরুষের নিষ্ঠার প্রত্যাশী। সে প্রেমিকের মধ্যে পূর্ণতর আদর্শ উপলব্ধি করতে চায়, হৃদয়ের অর্ঘ্য দিতে চায় স্বামীর বা প্রেমিকের পায়ে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে যখন সে দেখে আইডিয়ালিস্ট পুরুষের প্রেমেও কামের নগ্ন প্রকাশ, তখনই তার মোহভঙ্গ হয়। এই চেতনাটি "মানসী" কাব্যে 'নারীর উক্তি' কবিতায় স্ফুটনোন্মুখ, কিন্তু সুস্পষ্ট নয়। নারী ও পুরুষের স্বপ্ন-লীলা ও আদর্শবাদের দ্বৈরথ ও বেদনা বিশেষ ক'রে পরিস্ফুট "রাজা ও রানী" নাট্যকাব্যে ও "যোগাযোগ" উপন্যাসে। "রাজা ও রানী" নাট্যকাব্যে নারীর মোহভঙ্গের ট্র্যাজেডি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্ররচনায় সেই বেদনাময় আবহ এক "যোগাযোগ" ব্যতীত আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি।

সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে "সোনার তরী"তে। বিশ্বজীবনের পটভূমিতেই ব্যক্তি-জীবনের প্রেম মহিমান্বিত হয়েছে। তাই—

দেবতারে প্রিয় করি
প্রিয়েরে দেবতা।

'হৃদয়যমুনা'তে প্রেমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, প্রথম প্রেমের শরম-সংকোচ, আহ্বান ও পরিণামে দুয়ের নিরবচ্ছিন্ন মিলন লক্ষণীয়। "মানসী"র মতো "সোনার তরী"তেও নরনারীর প্রেমের দুটি ভিন্ন ভাব ব্যক্ত হয়েছে 'তোমরা ও আমরা' কবিতায়। প্রেমে মঙ্গলমাধুর্যের ধারণা এবং নারীর পক্ষে সেবা ও পুরুষের পক্ষে পৌরুষের সাধনা— রবীন্দ্রপ্রেমের এই অভিপ্রায় উচ্চারিত হয়েছে 'সোনার বাঁধন' কবিতায়। প্রথম প্রেমের দ্বিধাজড়িত লজ্জা ও ভীরুতা নয়, বাসনারঙিন স্বপ্নবিলাসও নয়, সংসার-সংগ্রামে দম্পতির সতেজ ও বলিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ কণ্ঠ এখানে শোনা গেল।

এই নবজাগ্রত প্রেম আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে "চিত্রা" কাব্যে। রবীন্দ্রপ্রেমে দুইনারী-তত্ত্ব এবং প্রেমের দ্বৈতলীলার ভাবরূপ 'উর্বশী', 'রাত্রে ও প্রভাতে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার স্বর্গরাজ্য, তার জন্য অন্তহীন ব্যাকুলতা, আর সুখ দুঃখ ক্ষমা সেবা দিয়ে ঘেরা এই পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ— এই ভাবই ঐ কবিতাগুলির মুখ্য অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ পুরুষপ্রকৃতির আত্যন্তিক অসন্তোষের মর্মব্যাখ্যা দিয়েছেন :

পুরুষেরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে এই জন্য জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না।[১]

অখণ্ড সম্পূর্ণতার প্রত্যাশা "মানসী"তে 'পুরুষের উক্তি' কবিতায় ধ্বনিত। এই পূর্ণতার সাধনাতেই তার অতৃপ্তি জাগে।

অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে সেই যুগযুগান্তরের প্রেয়সী, অপূর্ব শোভনা উর্বশীর জন্য পুরুষের তৃষ্ণা, উন্মাদনা, স্বপ্নবিলাস। তাই—

১ চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড

অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।

কিন্তু সে-রূপসী, সে অধরা স্বপ্নসঙ্গিনী বাস্তবের বন্ধনে ধরা দেয় না। প্রত্যাশা মেটে না, তা পরিতৃপ্ত হয় না মানবীর মধ্যে। তাই মর্মমূলে বাসা বেঁধে আছে অন্তহীন ব্যাকুলতা। 'ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা' তার 'চরণশোণিমা'। বুঝি বা রক্তমূল্য দিয়ে পেতে চায় পুরুষ সেই অধরা মোহিনীকে, কিন্তু সে বন্ধন মানে না। তবু 'আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে।'

"চিত্রা" কাব্যে একই সঙ্গে প্রেমের দ্বৈতলীলাবাদ ও চির-অধরার জন্য ক্রন্দন যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি আবার কবির মনে সুখদুঃখময় যুগল-জীবনের কল্যাণের ধারণাও প্রবল। মরজীবনে প্রেমের কল্যাণময় রূপটিই যেন অধিকতর কাম্য। সংসারের বিচিত্র কর্তব্যে ও বিপুল দায়িত্বে মানবীর মহীয়সী রূপ দেখেই পুরুষের সম্ভ্রম জাগে।

"চিত্রা"-পরবর্তী "চৈতালি" কাব্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে অভিজ্ঞ পুরুষ নারীকে সত্যভাবে জানবার চেষ্টা করছে। হৃদয় বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে কেন তার বিভ্রান্তি ঘটে। বিভ্রমের অবকাশ ঘটায় তার নিজেরই অন্তর, কেননা—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।……
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

এই কল্পনা ও তার মোহভঙ্গের ট্র্যাজেডি নারীপ্রেমেও অনিবার্য। ভালোবাসায় প্রেমপাত্র আর সাধারণ রক্তমাংসের মানুষটি থাকে না, তাকে ঘিরে রসাবৃত একটি সত্তা সৃষ্ট হয়। নরনারী উভয়েই উভয়কে তখন স্বপ্নাঞ্জন-আঁকা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে

দেখে। প্রেমে ঐ সাধারণ অস্তিত্বটুকু ছাপিয়ে আকাঙ্ক্ষিত উত্তমের রসমূর্তি জন্ম নেয়। এ-অবস্থা পুরুষের পক্ষেও যেমন সত্য, নারীর পক্ষেও তেমনি।

"চৈতালি"র প্রেমের কবিতার একটি অভিনবত্ব এই যে, এখানে মিলনেও ইন্দ্রিয়ের মত্ততা নেই। নিবিড় মিলনের ক্ষণেও প্রেমিক ভোক্তা নয়। মিলনের আবেশবিহ্বল মুহূর্তে সুখ যেন মধুর বেদনায় রূপান্তরিত। সুখ এবং দুঃখ একই বৃন্তে বিধৃত হ'য়ে আছে :

আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।···
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি।

রবীন্দ্র-প্রেমতত্ত্ব ব্যবধানের ব্যাপ্তি দিয়েছে ভোগের অবসানে, দুঃখের অগ্নিস্নানে। এই ভাবব্যঞ্জনাই 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত' কবিতা দুটির ঐশ্বর্য-সম্পদ। "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে অতুলনীয় ভাষায় কবি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে-প্রেমের অধিষ্ঠান ছিল 'কল্পকুঞ্জবনে নিভৃতে', কেবলমাত্র সীমিত ছিল 'প্রেয়সীর সনে যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে', যেখানে নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী— সেই 'বাসরভবনে'

ঊর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল······, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ; ·····
সহসা তুলিয়া নিল রঙ্গযবনিকা—

তারপর সেই নিরবচ্ছিন্ন ভোগাসক্তি পরিশুদ্ধ হ'ল দুঃখের আগুনে। বিমুক্ত হৃদয়ের চেতনাই প্রেমের প্রকৃত রূপ। "চৈতালি"র প্রেমে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, আত্মনিবেদনেই হৃদয়-সাযুজ্যলাভ।

"কল্পনা" কাব্যে এই আত্মনিবেদনে আর-একটি ভাব যুক্ত

হয়েছে— তা হ'ল সকরুণ মিনতি। এই দুই ভাবসংগতি অভিনব রস সৃষ্টি করেছে 'মার্জনা', 'ভিখারি', 'যাচনা' প্রভৃতি কবিতায়।

"ক্ষণিকা"য় সহজ সরল স্বল্পস্থায়ী এই ভঙ্গুর জীবনের ব্যক্তি-প্রেমের রূপ সুস্পষ্ট। যৌবনোত্তীর্ণ কবিচিত্তের নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই এখানে। প্রেম এবং প্রেমের বিরহকে কবি সহজভাবে স্থান দিতে চান, সহজভাবে গ্রহণ করতে চান। তাই জীবনের বাঁকে-বাঁকে নতুনতর পরিচয়কে অবহেলা করতে পারেন না। কেননা, স্বল্পপরিসর মর-জীবনে প্রেমের পরিধিই বা কতটুকু? প্রেম যে 'আজকে শুধু একবেলারই তরে।' সুতরাং 'কখন তবে বিলাপ করি!'

বিশ্বজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষের জীবন স্বল্পায়ু, সুতরাং ক্ষণপ্রাপ্তিকেই সম্পদ ব'লে গ্রহণ ক'রে কবি সমৃদ্ধ হ'তে চান। আজ যা ভালো লাগল, কাল তার প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে যায় তবে বিদায়কে সহজভাবেই মেনে নেবেন। কোনো ক্ষোভ নেই, প্রসারিত হৃদয়ের প্রসন্নতায় বিচ্ছেদের হাহাকার জাগবে না, পরম লগ্নের প্রাপ্তিই সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। বেদনা যদি বা তীব্র হ'য়ে সেই মুহূর্তে দেখা দেয় কিন্তু থাকে কি সেই তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভব কালের বিবর্তনে?—

পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।...
চিহ্ন কি আছে শান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা।

"শেষের কবিতা"র নির্বন্ধন ভাবসাযুজ্যের পূর্বাভাষ "ক্ষণিকা"র প্রেমে লক্ষণীয়। "ক্ষণিকা"র প্রেমে বিশেষ কোনো দাবি নেই। কিন্তু এখানেও কবি সর্বশেষের গানটি শেষপর্যন্ত গৃহলক্ষ্মীকেই শুনিয়েছেন।

"মানসী"র 'তবু' কবিতা থেকে শুরু ক'রে "উৎসর্গ"-এর 'লীলার ছল' এবং "কল্পনা", "ক্ষণিকা"র অধিকাংশ কবিতার মধ্য দিয়ে প্রেমের যে-বৈচিত্র্য ও লীলার দিকটি কবিচিত্তে পরম উপভোগ্য, সে-লীলাবৈচিত্র্য ঠিক দাম্পত্যলীলা নয়; বরং বলা যায় বন্ধনহীন প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিময় ব্যঞ্জনা। কাব্য-নাট্যে ও উপন্যাসে এই প্রেমের বিশেষ পরিচয় রয়েছে "বিদায় অভিশাপ" ও "শেষের কবিতা"য়। পূর্ববর্তী বাংলা প্রেমসাহিত্যে এক বৈষ্ণবকাব্যে মান কলহান্তরিতা ইত্যাদির দ্বারা প্রেমের বৈচিত্র্য দেখানোর যে-চেষ্টা লক্ষিত হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌনঃপুনিক। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে লীলাবৈচিত্র্যের দিকটি সত্যিই অনুপম।

"স্মরণ" ও "উৎসর্গ" কাব্যে প্রেম স্মৃতিসুখের ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন—এখানেই "পূরবী"র সুরের আভাস। "স্মরণ", "উৎসর্গ" ও "পূরবী"তে অনেক সময় বিস্মৃতির কুয়াশা থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে ক্ষণিকের দ্যুতি, কখনো দ্বিধাজড়িত স্মরণের আবরণে স্বীকৃত হয়েছে প্রেমের ঋণ। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বিপুল রবীন্দ্রকাব্যে কবির ব্যক্তিগত শোক ও বিরহবেদনা খুব অল্পই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তবে "কড়ি ও কোমল" কাব্যের দ্বন্দ্ব-বেদনা এবং "উৎসর্গ", "স্মরণ", "বলাকা"র 'ছবি' কবিতা ও "পূরবী"র 'কৃতজ্ঞতা' 'পূর্ণতা' 'কিশোর প্রেম' কবিতাগুলিতে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের শোক ও বিরহ-বেদনা স্পষ্ট-ভাবেই ছায়া ফেলেছে।

"বলাকা"র পর্বে পৌঁছে কবি প্রেমকে জীবনের বৃহত্তর পূর্ণতার ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন। সে-প্রেম অসংখ্য দাবি-দাওয়ায় আবদ্ধ করবে না, রইবে না তার ভার; সে-প্রেম মুক্ত করবে, জাগ্রত করবে চেতনাকে। পরবর্তী "মহুয়া", "পূরবী"তে এই

প্রেমেরই লীলা ও জয়গান ঝংকৃত হয়েছে। চলিষ্ণু জীবনের সঙ্গে সহজ সংগতিই শ্রেষ্ঠ প্রেম। "বলাকা"তে কবি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন— প্রেমের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে, বিশেষ বস্তুরূপই শুধু অন্তর্হিত হয়।

—হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

যুগল নারীমূর্তির মধ্য দিয়ে প্রেমের দুটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে "বলাকা"র 'দুই নারী' কবিতায়। একজনের 'অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা', সে অশ্রুর শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ করে। আর-একজন 'অনন্ত তৃষ্ণা' জাগায়, 'ফাল্গুনের সুরাপাত্র হাতে' মনপ্রাণ হরণ করে, আহ্বান করে পুষ্পিত প্রলাপে।

সমাজ-অনুশাসনে পীড়িত ব্যক্তিসত্তার ব্যর্থতা নিয়ে কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে "পলাতকা"য়। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ-ঘোষণা যেমন 'নিষ্কৃতি' কবিতায়, তেমনি অন্যদিকে আবার 'কালো মেয়ে'র 'কথাটা কান্না হয়ে বোবার মত ঘুরে বেড়ায় বুকে।'

এর পরে "পূরবী" ও "মহুয়া"র কবিতা। নানা অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ, প্রশান্ত ও আত্মসমাহিত এ-প্রেম। স্বাধিকারপ্রমত্ততার অবসানে ধ্যানের প্রগাঢ় উপলব্ধি, সিদ্ধি, স্তব্ধতা। অকুণ্ঠ এই প্রেম পৃথিবী-পলাতক নয়, আবার সম্ভোগের কারাগারে অধিকারিত্বের দাবিতেও শৃঙ্খলিত নয়; সে-প্রেম সত্য-প্রতিষ্ঠ। প্রেমিক ও প্রিয়ার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পরিচয়; বিনয়ের নম্র মাধুর্য আর পৌরুষের স্তব্ধ সৌম্য সমন্বয়ে অভিনব। আড়ম্বরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, রুদ্রের রোষবহ্নিতে অমোঘ সম্মোহ পুড়ে প্রেম হয়েছে নিখাদ সোনা। তথাপি এই প্রেমেও অতীত যৌবনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলির স্মৃতিমুগ্ধতা জেগে ওঠে।

সেই সব 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল' চঞ্চল চৈত্ররাতের দিনগুলি 'শূন্যের অকূলে' ভেসে গিয়েছে কিনা সে-কথাও কবিকে ভাবিয়ে তোলে।

"মহুয়া" গ্রন্থেও প্রেম আত্মানুসন্ধান-উন্মুখ। নারী শুধু ভালোবাসার স্বপ্নবিলাসের সামগ্রী নয়; 'ক্লেদঘন চাটুবাক্যে' তার প্রেম অপমানিত হয়। 'মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত গীতে' তাকে আর আহ্বান করা বৃথা। যে-নারী দুর্গমের পথে হবে যাত্রাসহচরী, কেবলমাত্র 'বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী' বাসরকক্ষে যাবে না সে; প্রেমের বীর্যে বীর্যশালিনী পৌরুষ-জাগরণে সহায়ক হবে, শুধু 'সেবা-কক্ষে' তার আহ্বান আর পূর্ণ সার্থকতা পাবে না। সে-নারী 'আত্মার সঙ্গিনী।'

আধুনিক যুগ-পরিবেশে প্রেমের ভঙ্গিও রূপান্তরিত। কেবলমাত্র চিরপ্রচলিত আদর্শনিষ্ঠা নয়, রূঢ় জীবনবোধের দৃঢ়তা ও যুগোচিত অনুভূতির ঐক্যসাধনে নবতর প্রেমের উজ্জীবন অবশ্যকাম্য। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সৃজনীশক্তিতে বিশ্বাসী ব'লেই তাঁর প্রেমকাব্য নব-নব মহিমায় উদ্ভাসিত।

এই মুক্তিপ্রয়াসী প্রেমের প্রতিদিবসের ব্যবহারিকতায় স্পর্শম্লান হওয়ার সম্ভাবনা স্বল্প। এ হ'ল দুটি আত্মার মিলন—বাহ্যিক সংসার-পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্বন্দ্বমুক্ত আত্মার আত্মীয়তা স্বীকার। কোনো ভার নেই, কোনো দায় নেই। যদি বিদায়ের ক্ষণ আসে, সে-ভালোবাসার পথ মুক্ত হবে সহজেই। কিন্তু অক্ষয় হ'য়ে থাকবে পরমক্ষণের আশ্বাস ও মিলন। সেই অপরিবর্তনীয় অর্ঘ্য মহৎ প্রাপ্তিরূপে সঞ্চিত থাকবে হৃদয়ের মন্দিরে। বিচ্ছেদের দিগন্তব্যাপী ব্যবধান কবিচিত্তে 'বিচিত্র খেলা'রই আয়োজন। বিরহ ব্যতীত প্রেমের পূর্ণতা নেই; বিচ্ছেদের আকাশে ধ্যানে ও বোধে প্রেম চিরন্তনরূপে রসমূর্তি পাবে। বিশেষ ব্যক্তিপ্রেম

রূপান্তরিত হ'য়ে প্রেমস্বরূপের বিশ্বব্যাপী মূর্তি লাভ করবে—এইজন্যই প্রেম মৃত্যুঞ্জয়। সায়াহ্নের "শেষ সপ্তক"-এ প্রেমের এই কালজয়ী অমর্ত্য রূপ ও বিরহসাধনায় তার নির্বিশেষ স্বরূপ উন্মোচিত হ'ল—

সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,...
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা।

নাটকে

রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের যে শান্ত ও কল্যাণ রূপ উদ্ভাসিত-রবীন্দ্র-নাটকও তা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত নয়। রবীন্দ্রকাব্যে যে-অগ্রগতি দ্রুত সম্ভব হয়েছে, উপন্যাসে বা নাটকে তা হয় নি। কারণ কাব্য কল্পনাশ্রয়ী, নাটক-উপন্যাসের আশ্রয় বাস্তব মানুষ এবং সামাজিক পরিবেশ। তবে রবীন্দ্রনাটকে অনেক সময় প্রেমাদর্শের রূপায়ণ হয়েছে প্রতীকী চরিত্রে।

"নলিনী" ও "মায়ার খেলা" এই দুটি নাটকে প্রেমের হাস্য-চপল ও শান্তগভীর দুটি রূপই পরিস্ফুট। এখান থেকেই প্রেমকে তিনি আশ্রয়ে ফিরিয়ে এনেছেন। দুঃখ বা বিরহ বাদ দিয়ে যে প্রেমের পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয় এ-উপলব্ধিও এই দুটি নাটকে আছে। "মায়ার খেলা"য় শান্তা অমরকে বলছে—

তোমার সকল দুখ আমি সহিব।…

ভুলভাঙ্গা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে…।

জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে প্রেমের অপরিহার্যতা নাটকে এবং প্রহসনেও সমর্থিত হয়েছে।

মানুষ তার স্বভাবধর্মকে ত্যাগ করতে পারে না। তা করতে গেলে অনেক সময় নিজের সৃষ্ট অবরোধে প্রাণ এমনি হাঁপিয়ে ওঠে যে তখন তা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে এবং নিজের প্রকৃতির কাছেই পরাভূত হয়। "প্রকৃতির প্রতিশোধ"-এ স্বাভাবিক মানবধর্মকে অস্বীকার ক'রে সন্ন্যাসী 'সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে'। "প্রকৃতির প্রতিশোধ"-এর মতো "চিরকুমার সভা"তেও মানুষের পরাজয় ঘটেছে তারই অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কাছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকৌমার্যে আস্থাবান ছিলেন না। সংসারবাসী সাধারণ মানুষের পক্ষে চিরকৌমার্য-ব্রত ধারণ ক'রে যৌবনকে উপেক্ষা করবার বা ভুলে থাকবার প্রয়োজনও দেখেন নি তিনি। কৌমার্য-ব্রতী অতিসচেতন স্পর্শকাতর পুরুষের প্রতি কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন "চিরকুমার সভা"তে। প্রচ্ছন্ন উপহাসও করেছেন কখনো-কখনো। প্রেমের লঘু চপলতা এমনকি মূঢ়তাও কবির কৌতুকী দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রেমের হাস্যকর রূপ দেখতে পাই "গোড়ায় গলদ", "বৈকুণ্ঠের খাতা", "প্রজাপতির নির্বন্ধ" প্রভৃতি নাটকে।

রবীন্দ্রনাথ 'লীলা'খণ্ডের কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন—

ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সঙ্গতকে নহে অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে।… বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না,—একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ

অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময় ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।[১]

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

“ক্ষণিকা” কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় ও কয়েকটি প্রহসন-জাতীয় নাটকে এই প্রেমলীলার স্বরূপ সুপরিস্ফুট। লৌকিক প্রেমের যে একটা লঘু চপল দিক আছে কবি সেটিকেই কৌতুকময় ভঙ্গিতে, কখনো বা পরিচ্ছন্ন পরিহাস-রসিকতায় প্রকাশ করেছেন এইজাতীয় রচনায়। হাসি, কৌতুক, চাপল্যের বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে আসল বস্তুটা অনেক সময় আত্ম-গোপন ক'রে থাকে। সামান্য ইঙ্গিতে আভাসে অনেক সময় মানুষের অন্তর্গূঢ় চেতনার উন্মেষ ঘটে, কখনো বা জটিল ভাবের সৃষ্টি হয়।

প্রেম জীবন থেকে বড়ো নয় সত্য। কিন্তু জীবনসম্ভূত এই হৃদয়সাধনার সন্ধান মানুষকে করতেই হবে। “রাজা ও রানী” নাটকে জীবনে প্রেমকে সহজভাবে স্থান দেবার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই বলি :

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর একজায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্য স্বতউদ্যত হয়েছে যে,

১ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।[১]

পরবর্তীকালে "তপতী"র ভূমিকায় আবার বললেন—

সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রানীর মূল কথা।

"তপতী" নাটকে সুমিত্রা বলছে—

…তোমার প্রেম তোমার প্রেমের পাত্রকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেচে…তোমার চিত্তসমুদ্রে যে তুফান উঠেছে তাতে পাড়ি দেবার মত আমার এ তরী নয়— উন্মত্ত হয়ে যদি ভাসিয়ে দিই তবে মুহূর্তে এ যাবে তলিয়ে। আমার স্থিতি তোমার প্রজাদের কল্যাণলক্ষ্মীর দ্বারে— সেখানকার ধূলির 'পরেও যদি আসন দিতে, আমার লজ্জা দূর হত।

নারীস্বভাবে আছে বীর্যশালী বলিষ্ঠ পুরুষের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। সুমিত্রা বিক্রমের প্রেম তপস্যা ক'রে পেতে চায়। বিক্রমের পৌরুষকে জাগ্রত করবার জন্যই সুমিত্রা রাজগৃহ ত্যাগ ক'রে গেল। সুমিত্রার মধ্য দিয়ে নারীমূর্তির যে-বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়, সেই নারীরূপ রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে নূতন সুর যোজনা করেছে। "রাজা ও রানী"র মধ্যে সুমিত্রা-চরিত্রে যে-সূচনা দেখা গেল, তার পূর্ণতর রূপ "রক্তকরবী"র নন্দিনী-চরিত্র।

সুমিত্রার প্রকৃতি যে মহৎ পুরুষের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে, বিক্রম-চরিত্রে সে-মহত্ত্ব অনুপস্থিত। তাই বলতে হয় ট্র্যাজেডি

১ "রাজা ও রানী"র ভূমিকা

এদের স্বভাবেই নিহিত। রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছি সুমিত্রার ট্র্যাজেডির সঙ্গে কুমুদিনীর ধ্যানভঙ্গের যেন একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে। সংসারে দুটি মনের গতি ক্বচিৎ এক ধারায় ধাবিত হয়। যেখানে এই বিস্ময় একত্র মিলিত হয় সেখানে জীবন অমৃতের স্বাদ লাভ করে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবনের পাকা বনিয়াদ গড়তে গিয়ে দু-জনকেই কিছু-কিছু ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বিক্রম বা মধুসূদন, সুমিত্রা ও কুমুদিনীর জন্য নিজেদের যোগ্য ক'রে তোলা দূরে থাক, ওদের বুঝবার চেষ্টাও করে নি।

সুমিত্রা স্বামীকেই ভালোবাসতে চায়। কিন্তু কর্তব্য ভুলে সে-স্বামী পত্নীর আঁচলের তলায় এসে বিশ্রাম নেবেন— এই কাণ্ড-জ্ঞানহীন আসক্তিতে তার অন্তর পীড়িত হয়, আহত হয় গৌরব ও মর্যাদা-বোধ। সুমিত্রার প্রেমে বিরোধ বেধেছে কর্তব্যজ্ঞানহীন পরুষ দম্ভে। সুমিত্রার ট্র্যাজেডি এই যে, তার প্রেম বিক্রমকে জাগাতে পারে নি। কুমুদিনীর হৃদয় স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে পুষ্পিত লাবণ্যে বিকশিত হ'তে চায়। সুকুমার সুন্দর ভাবের ভৃঙ্গার হ'তে যে-সুধা বর্ষিত হবে যুগলের জীবনে তা ঊর্ধ্বলোকের আশ্বাস বহন ক'রে আনবে। কিন্তু বিধি বাম। কুমুদিনীর প্রেমের ধ্যান ভেঙে দিয়েছে কাম ও ঐশ্বর্যগর্বের লোল স্পর্শ।

প্রেমের আসল রূপ হ'ল দুয়ে মিলে এক অখণ্ড সংগীত সৃষ্টি। দুটি সত্তায় ভাবসম্মিলন না হ'লেই সব বিপর্যস্ত হবে। সুমিত্রা নিষ্কৃতি পেয়েছে আত্মবলিদানের মধ্যে। "যোগাযোগ"-এ এই সমস্যা অন্য দিক দিয়ে সমাধানের চেষ্টা আছে। সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে কুমু ও মধুসূদনের যৌথজীবন এগিয়ে চললেও মধুসূদনের মধ্যে কুমুদিনীর আদর্শসন্ধানী মাধুর্যময়ী নারীপ্রকৃতির তৃষ্ণা মিটতে পারে না। কুমুর ট্র্যাজেডি সারা জীবনভোর।

"রাজা ও রানী", "বিসর্জন" ও "তপতী"তে কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের বিরোধ এবং আত্মবিসর্জনের দ্বারা সে-বিরোধের অবসান। "রাজা ও রানী"তে সুমিত্রা-বিক্রমের বিরোধের পাশে আর-একটি প্রেমসংগীতের অস্ফুট কাকলি শোনা যায়— সে-প্রেম ইলা ও কুমারসেনের।

সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের উত্তরসাধিকা হ'ল নন্দিনী ও লাবণ্য। যাদের মধ্যে এক-জাতীয় গুণ অধিক ব'লে বোধ হয়, সাধারণ-ভাবে তাদের সগোত্র বলতে বাধা দেখি না। সুমিত্রা, সুচরিতা, লাবণ্য— এরা এক-জাতীয়। এদের ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা ও আত্ম-গরিমাকে ঘিরে আছে ধ্যানময় জ্যোতির্মণ্ডল। আর দেবযানী, বাঁশরী, শ্যামা— এই দৃপ্ত উদ্ধত নারীচরিত্রগুলি সগোত্র। এরা প্রেমের জন্য নিষ্ঠুর নির্মম হ'তে পারে, সর্বস্ব ত্যাগও করতে পারে।

পুরুষ আইডিয়ালিস্ট সত্য, কিন্তু পরীক্ষার মুহূর্তে সেই আইডিয়ালিস্টের মধ্য থেকেই বুভুক্ষিত আদিম মানুষ বেরিয়ে আসে। জীবনরসিক পুরুষের শিল্পীসত্তাকে গ্রাস করে তার অন্ধ কামনা। ব্যক্তি-অভিরুচির গর্ব, আদর্শবাদ, কোনো-কিছুর আত্মপ্রসাদেই অমোঘ জীবধর্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই। অর্জুনের স্বেচ্ছাসৃষ্ট অবরোধ অবাস্তব ব'লে বোধ হ'ল যখন চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার দেখা হ'ল মুখোমুখি। অর্জুন তপস্বীর গর্ব ত্যাগ করতে উন্মুখ, আর চিত্রাঙ্গদাও পরুষ-বর্ম তাগ ক'রে নারী হ'য়ে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আমরা জানি, কামনার যে-বিষবাষ্প উলঙ্গ উন্মত্ততায় মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়, তার উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল বর্ণনায় স্বভাবতই বিমুখ রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্য। তাই "চিত্রাঙ্গদা" নাট্যকাব্যের পরিসমাপ্তিও শান্ত, সংযত। কিন্তু এই উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষারও মনোহারিত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। শেষ বয়সের রচনায় ক্রান্তদর্শী শিল্পী সেই

শাশ্বত কামনাকে তার কক্ষপথে নিজস্ব গতিতে আবর্তিত হ'তে দিয়েছেন, বাধা দেন নি। কয়েকটি উপন্যাসে, "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে এই প্রেমের সম্মোহ শক্তির লীলা কবি দেখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। সেখানে সর্বগ্রাসী আদিম বাসনার সসংকোচ প্রত্যাখ্যান নেই। "চিত্রাঙ্গদা" নাট্যকাব্যের প্রেমে সম্মোহ ও পৌনঃপুনিক দেহসম্ভোগ প্রেমিকযুগলের চিত্ত অবসাদগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। তাই অলস নিরবচ্ছিন্ন মিলন আর নয়, তারা সংসারের কর্তব্য-কর্মের অংশ গ্রহণ করতে ব্যগ্রকাতর। অরণ্যচারী বন্য আকাঙ্ক্ষা গৃহের শান্তি ও কল্যাণের জন্য উন্মুখ :

ওই শোন
প্রিয়তমে বনান্তরে দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

নারীর পক্ষেও ভালোবাসাই যে ধর্ম এবং ভালোবাসার বন্ধনই যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলেছেন। নারীর দেহগত রূপের চেয়ে অন্তরমাধুর্য, নারীত্বের মহিমা যে শ্রেয় এ-কথাও চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের দ্বন্দ্ববেদনার মধ্যে পরিস্ফুট। রূপ-মুগ্ধতা থেকে যে-প্রেমের জন্ম তা শুধু প্রিয়ার দেহের প্রতিই অতৃপ্ত অদম্য আকর্ষণ, কিন্তু তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার চেয়ে স্থায়ী সেই প্রেম যা উপজিত অন্তরমাধুর্যের আকর্ষণে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার দেহ-রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ কিন্তু চিত্রাঙ্গদার অন্তর তাতে শান্তি পায় নি। তার বেদনা—

এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি
শতগুণে।...বুক ফেটে মরি
যদি আমি, তবু আমি আমি রব।

স্তম্ভিত হ'তে হয় এই সূক্ষ্ম বেদনাময় অনুভূতির ব্যাখ্যা শুনে। মায়াবী রূপও তার নিজের দেহের, কিন্তু তাকেও সে বিশ্বাস

করে না। কেননা ক্ষণস্থায়ী যে-রূপ নিয়ে মানুষের গর্ব, ক্ষণিক মাদকতা বিকিরণ ক'রে সে-সৌন্দর্য ঝ'রে যাবে। কিন্তু এই গর্বিত অন্তরে তখনই ফুটে উঠবে আসল রূপ, আর সেই আন্তর-রূপেই মানুষ সুন্দরতর এবং শ্রদ্ধেয়। নারীর প্রকৃতিতে হ্লাদিনী-শক্তি, সেবা ও কল্যাণ-শক্তি— এই তিন গুণের সমন্বয়। বোধ, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই লীলাময়ী নারীর সেবাময়ী কল্যাণী মূর্তি প্রকাশ পায়। চিত্রাঙ্গদা পরুষ-গর্ব ত্যাগ ক'রে রূপবতী রমণী হ'তে চেয়েছে, আবার সেই যৌবন-রূপের আত্মপ্রসাদ ত্যাগ ক'রে হ'তে চেয়েছে কল্যাণী। নারীপ্রকৃতিতেই আছে সেবার ভাব, তাই প্রেমিকের প্রতিও তার সেবা ও শুশ্রূষার পরম ঔৎসুক্য। শুধু পুরুষের বুকের রক্তে দোলা জাগিয়েই প্রেমিকার প্রেম সার্থক হয় না। তাকে তৃপ্ত, আশ্বস্ত, শান্ত ক'রেই তার প্রকৃত আনন্দ। নারীর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে প্রিয়া-সত্তা ও মাতৃসত্তা। নারীর মাধুর্য পুরুষের শক্তিমত্ত কর্মব্যস্ত জীবনে যেখানে আনে প্রেরণা, আনে সংসার ও প্রেমের, দেহ ও মনের সামঞ্জস্য— সেখানেই নারী ও পুরুষের মিলন সার্থক।

এই কথা "রক্তকরবী"রও মর্মকথা। পুরুষকে কর্মপথে, সত্যপথে উদ্বুদ্ধ করতে নারীশক্তির সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। পুরুষের উন্মত্ত গতিবেগকে সংহত ক'রে মাধুর্য সঞ্চার করে নারী। কিন্তু মাধুর্য শুধু লালিত্য নয় বা সম্মোহও নয়, সত্যের নিরলংকৃত মহিমায় প্রবুদ্ধ নারী-মাধুর্য। যে আমিত্ব বিস্মৃত হয় নি, যে ব্যক্তিত্বশালিনী; সেই নারীই শক্তিমান পুরুষের যথার্থ সঙ্গিনী। সে 'যামিনীর নর্মসহচরী' বটে, সেই সঙ্গে 'দিবসের কর্মসঙ্গিনী'ও, কঠিন ব্রতের সহায়, সুখদুঃখের সহচরী।

"রক্তকরবী" নাটকে প্রতীকচরিত্র সৃষ্টি হ'লেও তার মধ্যে রবীন্দ্রপ্রেমাদর্শের মূলতত্ত্ব প্রকাশিত। বিশুর প্রেমে রয়েছে

বিরহের জয়ধ্বনি, আর নন্দিনীর মধ্যে ভাবীযুগের নারীর আভাস।

"চিত্রাঙ্গদা"র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

…মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল-জীবনের জয়যাত্রার সহায়।…এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

সকল প্রেমের পরম প্রাপ্তিই এই। তা যদি না হয় সেখানেই অনিবার্যভাবে ব্যর্থতা আসবে।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে আসে। চিত্রাঙ্গদার ও লাবণ্যের আত্মনিবেদনের বাণীতে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয় যদিও এ-দুটির রচনাকালের দূরত্ব অনেক। চিত্রাঙ্গদা বলেছে—

দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে
পুণ্য আছে, কত দৈন্য আছে…
কিন্তু আছে অক্ষয় অমর এক
রমণীহৃদয়।…
কুসুমের সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি
এইবার সেই জন্মজন্মান্তরের
সেবিকার পানে চাও।

আর লাবণ্য বলেছে—

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।

এই দুটি উক্তির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করতেন পুরুষের প্রেমের বৈশিষ্ট্য ক্ষমা এবং তপস্যা, আর নারীর প্রেমে সেবা।

"মালিনী" নাটকে দেখি, যে-ধর্মের প্রেরণা অন্তরের সাধনা-

জাত নয়, সেই ধর্ম-অনুসরণে প্রেমে দ্বন্দ্ব বেধেছে এবং তার পরিণতি হয়েছে বেদনাদায়ক। যে-অনভিজ্ঞ হৃদয়ে ধর্মের মূল সাধনায় দৃঢ় হয় নি, সেই অনভিজ্ঞ পুরুষ বা নারী যখন সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন দেখা যায় ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শে সেই ধর্মবোধের মূল শিথিল হ'য়ে পড়েছে— সুপ্ত প্রণয়াতুর মানবহৃদয় হাহাকার ক'রে উঠছে। মালিনী, ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়র জীবনে এই ধরনের বেদনা দেখা দিল। মালিনীর শেষ পরিচয় এবং যথার্থ পরিচয়—

দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।

"বিদায় অভিশাপ" ও "চার অধ্যায়"-এর ট্র্যাজেডিতে ভাবগত ঐক্য আছে। দুটি রচনারই অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা এই যে, উদাসীন আদর্শবাদী পুরুষকে নারী তার মোহিনী শক্তি দিয়েও জীবন-কেন্দ্রের দিকে টেনে আনতে পারল না। নীড়-রচনার আকাঙ্ক্ষা নারীর রক্তে মিশে আছে। দেবযানী রক্ত-মাংসের সাধারণ মানবী, তার বাসনা আছে, কামনা আছে, প্রেমাস্পদকে সে একান্তভাবেই পেতে চায়। কিন্তু যখন সে ব্যর্থ হ'ল, তখন সেই ব্যর্থ ক্ষুব্ধ প্রেম হ'য়ে উঠেছে প্রতিহিংসাপরায়ণ, সে কচকে অভিশাপ দিতেও ছাড়ে নি। প্রত্যাখ্যানের ক্ষমা নেই তার কাছে—

ক্ষমা কোথা মনে মোর
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর
হে ব্রাহ্মণ।

দেবযানীর ক্ষোভ এবং ক্রোধ যতই অপ্রশংসার হোক, তবু তার জন্য কি আমরা করুণা অনুভব করি না? দেবযানী তার বজ্রদীর্ণ হৃদয়খানি নিয়ে আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত

হ'য়ে আছে। যা-ই হোক রবীন্দ্রপ্রেম শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা বিক্ষোভে পরিসমাপ্ত হয় নি, বিচ্ছেদেও পরম সান্ত্বনা ও প্রশান্তি বহন ক'রে এনেছে। কচ মহৎ কর্তব্যের জন্য ত্যাগ করেছে নিশ্চিন্তনির্ভর সুখ। সে বলে, 'আমার যা আছে কাজ সে আমি সাধিব', যদিও 'চিরজীবনের সনে তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।'

পুরুষের কণ্ঠে এই যে অঙ্গীকার শোনা গেল, এই অপরিবর্তন-অর্ঘ্যনিবেদনের স্বীকৃতি নারীকণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে পরবর্তী কালে। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী বুদ্ধিতে চিন্তাশীলতায় পুরুষের সমকক্ষ হ'য়ে উঠেছে ব'লেই প্রেমেও দেখা দিয়েছে অভিনবত্ব।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে নিত্যধর্মরূপেই দেখেছেন। "সতী" নাটকে আচারধর্মের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে নিত্যধর্মের এবং শেষ পর্যন্ত প্রেম হয়েছে লাঞ্ছিত। অমাবাঈ বিধর্মীকে ভালোবেসে বিবাহ করেছিল, কিন্তু তার কাহিনী বড় করুণ। তার এই স্পর্ধা সমাজ সহ্য করে নি, তাকে মর্ত্যলোকে শাস্তি দেওয়া গেল না, কিন্তু পরলোকে যাতে সংস্কার আশ্বস্ত থাকে এই মিথ্যা সান্ত্বনায় সমাজ অমাবাঈকে বাধ্য করেছে পরপুরুষের চিতায় সহমরণে যেতে।

"বাঁশরী" রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা। এখানে নিত্যধর্ম আচারধর্মের বিরোধ বা কর্তব্য, অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রান্ত। এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা বুদ্ধিতে পরিপক্ক, পরিণত-বয়স্ক, শিক্ষিত ; এরা নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ ক'রে দেখে। মর্মজ্ঞ বাঁশরী, সুষমাকে সে বলেছে—

তুই পুরুষ নোস্, আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

"বাঁশরী" নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদরেখা টেনেছেন। যে প্রেয়সী সে থাকবে মানসে, অপ্রাপণীয়া ; সংসারের প্রতিদিনের তুচ্ছতায় তার দুর্লভত্ব খর্ব

হবার নয়। আর যাকে বিবাহ করা যাবে তার সঙ্গে ভালোবাসা না থাকলেও চলে।

সোমশঙ্কর ভালোবাসে বাঁশরীকে, বিবাহ করল সুষমাকে। আবার সুষমা ভালোবাসে পুরন্দরকে। কাজেই সোমশঙ্কর-সুষমার বিবাহ ভালোবাসার বিবাহ নয়, সুতরাং তাদের বিবাহে মোহের স্থান নেই, কামনাবাসনার স্থান নেই। এ-তত্ত্ব মানতে মন রাজি হয় না। যদি প্রেম নেই, মোহ নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, তবে শুধু দুটি নারী-পুরুষের সামাজিকভাবে মিলনেরই বা প্রয়োজন কি? আরও একটা কথা স্পষ্ট ক'রেই বলতে ইচ্ছা করে, ভালোবাসার বিবাহে যদি বা আত্মিক সম্বন্ধ বজায় থাকে, ভালো-না-বাসার বিবাহে তা থাকে কি? বিবাহের পূর্বেই হোক বা পরেই হোক ভালোবাসা না হ'লে বিবাহের না থাকে মূল্য, না থাকে মর্যাদা। বিবাহ মানে যদি আত্মিক দৈহিক সব সম্পর্ক সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া হয়, তা হ'লে সোমশঙ্কর ও সুষমার উদ্বাহবন্ধনে বিবাহের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি কোথায়?

আসল কথা, বাঁশরীর সঙ্গে বিবাহে সোমশঙ্করের ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা, কেননা বাঁশরীর মতো মেয়ের পক্ষে অন্যের চাপানো ব্রত নির্বিচারে গ্রহণ করা এবং পালন করাও অসাধ্য। সোমশঙ্কর-বাঁশরীর বিবাহে পরস্পরনির্ভর দাম্পত্য ভাব গ'ড়ে উঠতে পারে না, বাঁশরীর প্রকৃতিই সহনশীল নয়, সে নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও ত্যাগ করতে পারবে না। বাঁশরীকে কবি মোহভঙ্গ থেকে বাঁচিয়েছেন।

আবার সোমশঙ্করের বাঁশরীকে ভালোবাসা আর সুষমাকে বিবাহ ও তাকে নিয়ে ব্রতপালন, একই মনে এই দ্বিজাতীয় মানসিক ক্রিয়া পদে-পদে ব্যর্থতাই বহন ক'রে আনবে। তা ছাড়া বিবাহিত জীবনে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সোমশঙ্করের অন্তর

অনেকখানি দখল ক'রে নেবে সুষমা, সুষমার মনেও বেশির ভাগ স্থান জুড়ে থাকবে সোমশঙ্কর এবং যখন একদিন সোমশঙ্করের বুভুক্ষা আন্দোলিত মথিত ক'রে তুলবে তার সমস্ত দেহমন, তখন, সেই পরীক্ষার মুহূর্তে আর ব্রতভঙ্গের অনুকূল-প্রতিকূলতার কথা মনে থাকবে না— এ-কথা আমরা ধ'রেই নিতে পারি।

"শেষের কবিতা"র পরিসমাপ্তি যে-তৃপ্তি দেয়, বাঁশরীর সান্ত্বনার তুচ্ছতায় আমাদের অন্তর সে-শান্তি পায় না। যে-সম্ভাবনা নিয়ে "বাঁশরী" নাটক শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি বড়ো করুণ। বাঁশরী-চরিত্রের স্পর্ধিত ব্যক্তিত্ব, আত্মগরিমা ম্লান হয়েছে ; সর্বশেষ মিলটুকু যদি না থাকত তা হ'লেই বোধ হয় তার বেদনার আঘাত আমাদের আরও সচকিত ক'রে তুলত।

রবীন্দ্রনাটকের চূড়ান্তে এসে প্রেমের যে-রূপ দেখি তাতে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, প্রেম প্রেমই এবং বিবাহ বিবাহ মাত্র। প্রেমকে বিবাহের ব্যক্তি-অধিকারের বিশেষ গণ্ডিতে আবদ্ধ করলে তার খর্ব হবার সম্ভাবনা। লীলাময়ী হ্লাদিনী শক্তির যে-উন্মাদনা পুরুষচিত্তকে বিহ্বল করে, উদ্বেজিত করে, গৃহের বনিতা-রূপে পেলে আর তার সে-প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে না, বিশ্ববিধির নিয়মে সে হ'য়ে উঠবে সেবাময়ী কল্যাণী। সুতরাং একই নারীতে দুই সম্ভাবনা একই কালে বৃন্তবিধৃত হ'য়ে থাকতে পারে না। এই কারণেই চরম মীমাংসা কোনোদিনই সম্ভব নয়।

উপন্যাসে ও গল্পে

যে-কোনো একটি কাহিনী একটি বিশিষ্ট কাল-চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ— ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো। কথাসাহিত্য দেশ-কালের বিশেষ সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল, কারণ 'লেখকের

কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে।"[১] কিন্তু মহৎ শিল্পীর হাতে এই স্বতন্ত্র পরিবেশে বর্ণিত বিশেষ কাহিনীর পাত্রপাত্রীরা চিরকালের মানবপ্রতিভূ হ'য়ে ওঠে। তাদের আনন্দবেদনা বহু শতাব্দী পরে মানুষের মনে অনুরণন জাগায়, চিরন্তনতার আস্বাদও বহন করে।

কথাসাহিত্যে যেহেতু বিশেষ কাল, সে-কালের সমস্যা এবং অবস্থান্তরের আবেদন এসে পড়বেই, ঠিক সেই কারণেই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের পটভূমিকা মূলত বাঙালীজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলার পল্লীজীবনের পটভূমিতে সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখের কথাই রবীন্দ্রনাথ "গল্পগুচ্ছ"র অধিকাংশ গল্পে বলেছেন, আর উপন্যাসগুলির ভিত্তি প্রধানত বাংলার শিক্ষিত বিত্তশালী শহুরে সমাজ। তথাপি সমসাময়িক কালের জীবনধারা উপলক্ষ্য এবং অবলম্বন হ'লেও রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের প্রকৃতি, বিশেষ ক'রে "গল্পগুচ্ছ"র প্রকৃতি এই যে, সেখানে চলতি কালের সমস্যাই বড়ো নয়; তার মধ্যে শুধু আনন্দবেদনার, সুখদুঃখের, অনুভূতির নির্যাসটুকু ধরা রয়েছে। তার সামগ্রিক আবেদনে রচিত হয়েছে সকল কালের মানুষের হৃদয়ভাষ্য। চিরপ্রবহমান সুখদুঃখধারার মধ্যেই ব্যক্তিবিশেষের প্রেম, সুখদুঃখ ক্ষণকালীন তরঙ্গবিক্ষেপের মতো রবীন্দ্রসাহিত্যে কল্লোলিত হ'য়ে উঠেছে— বিশ্বমানব-জীবনের, বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট পটভূমিতে সংস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিজীবনের হাসিকান্না।

রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে বাঙালীর সমাজজীবনের পরিবর্তন ও দ্রুত অগ্রগতির ইতিহাস সুস্পষ্ট। "চোখের বালি", "নৌকাডুবি", "গোরা", "চতুরঙ্গ", "ঘরে বাইরে", "যোগাযোগ", "শেষের

১ সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল

কবিতা", "চার অধ্যায়" এক-এক সুচিহ্নিত স্তরবিভাগের সাক্ষ্য বহন করে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সমাজজীবনে মানবিক সম্বন্ধের জটিলতা বৃদ্ধি হয়েছে; দেশধর্ম, সমাজধর্ম, মানবধর্ম সব-কিছুর বিচিত্র জটিলতা রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে নানা দিক থেকে নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শিল্পীর রূপসৃষ্টিতে কোনো সচেতন উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়াস থাকে না। কেননা শিল্পী জীবনকে রসে প্রণোদিত করেন। জীবনকে, সৃষ্টিকে তার নিজস্ব পথে গতি দেন—পূর্ণ মর্যাদায় ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কাজ। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যেও সেই পূর্ণ মর্যাদায় জীবনের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রপ্রেম-দর্শনে মূল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়সাধনের চেষ্টায়। এই দুই বিপরীত কোটিতে কবিচিত্ত দোলাচল। কাব্যে যা ভাবরূপে ফুটে উঠেছে সেই ভাবনাকে অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্যে। একটি ক'রে কাব্যের পর্ব শেষ হ'লেই কাব্যের ভাবানুসারী দু-একটি উপন্যাস বা গল্প সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ছোটোগল্পের পরিমিত পরিসরে যেখানে শুধুমাত্র ইঙ্গিত বর্তমান, উপন্যাসের বিস্তৃত পরিধিতে সেখানে তথ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি এবং দ্বন্দ্বজটিলতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আশ্চর্যভাবে সুসমন্বিত হয়েছে।

মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত অথচ প্রত্যেক মানুষ আপন ব্যক্তিসত্তায় এত স্বতন্ত্র যে কোনো আদর্শ সমাজই তার মনের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। মানুষের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তব সংসারের দ্বন্দ্ব অনিবার্য, রবীন্দ্রনাথ বার-বার এ-কথা ভেবেছেন। তাঁর সাহিত্যে মানুষের এই সহজাত মানবিক দ্বন্দ্ব, ভালোবাসার স্বাভাবিক ও সামাজিক ঘাত-

প্রতিঘাতের কাহিনী অভিনব জিজ্ঞাসা ও আশা নিয়ে, অনেক সময় মর্মভেদী ব্যথা নিয়ে, ভাস্বর হ'য়ে আছে।

স্বভাবধর্মের বশেই মানুষ ভালোবাসে, সমাজধর্মের অনুকূল হোক বা না হোক সে তার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই স্বাভাবিক ভালোবাসাকে যখন সামাজিক ভালোবাসারূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, তখনই নানা বিপরীত আঘাতে মানুষের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে যায়। 'নষ্টনীড়'-এ এই সমস্যাই দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র নারী-পুরুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সহজাত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তব সংসারের দ্বন্দ্বকে সোজাসুজি পাপ ব'লে সমস্যাটির একরকম সমাধান ক'রে দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কারমুক্ত মন এবং সমগ্রদর্শী দৃষ্টি নিয়ে মানুষের সকল প্রকার অনুভূতি ও বাসনা-কামনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম নিন্দনীয় নয়, পাপও নয়।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথও সামাজিক মানুষ, সমাজচৈতন্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। সাংসারিক জীবনে বিবাহনিরপেক্ষ প্রেমের স্থান বহু ক্ষেত্রেই নরনারীর অন্তরেই আবদ্ধ থাকে। এইভাবেই সে-ভালোবাসা সার্থক হ'তে পারে। কিন্তু এই মানসিক স্থৈর্য ও ঔদার্য, শিক্ষা সংযম রুচি এবং মননশীলতার অপেক্ষা রাখে; তা না রাখলে নীড় নষ্ট হবারই সম্ভাবনা।

রবীন্দ্র- কাব্য ও নাটকের মতো কথাসাহিত্যেও প্রেম আলো-ছায়ার বিচিত্র স্তর পার হয়েছে। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের বিভিন্ন নারীচরিত্র আলোচনা করলেই এই ক্রমপর্যায়ের ব্যাখ্যা মিলবে। প্রেয়সী নারী, কল্যাণময়ী জননী নারী এবং ব্যক্তিত্বময়ী মাধুর্যময়ী রমণী— নারীর সর্বাঙ্গীণ মূর্তিই রবীন্দ্রসাহিত্যে মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীকে দিয়েছেন আত্মচেতনা, আর প্রেমকে দিয়েছেন অভয় মন্ত্র, উদার প্রসন্ন মূর্তি।

"চোখের বালি" থেকেই রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যে প্রেমের দ্বন্দ্ব-জটিলতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য এর পূর্বে 'নষ্টনীড়' গল্পটিতেই সে-সমস্যার সূচনা।

নীড় বাঁধবার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা নারীর রক্তে প্রবাহিত। বঞ্চিতা বিধবা বিনোদিনী অতৃপ্ত বাসনায় জর্জরিত হ'য়ে মুহূর্তে মহেন্দ্রকে গ্রাস করতে চেয়েছে। কিন্তু বিনোদিনী না মহেন্দ্রকে, না বিহারীকে, কাউকেই গ্রহণ করে নি। বিনোদিনীর বীতরাগ ও আশার একান্ত নির্ভরতা অব্যবস্থিতচিত্ত দীনস্বভাব মহেন্দ্রকে ফিরিয়ে এনেছে। আর বিহারীর ভালোবাসাকে গ্রহণ না ক'রে বিনোদিনী স্বহস্তে বঞ্চনার দণ্ড নিয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে— কেন এমন হ'ল। এই যদি পরিণতি হয় তবে এত আয়োজনের কি প্রয়োজন ছিল? ঘূর্ণিবাতাসে সব ওলটপালট হ'য়ে গিয়েও এই নিষ্ঠুর সমাপ্তি কেন ঘটল? বিনোদিনীর নিঃস্পৃহ, নির্বীর্য ভাব দেখে বিস্ময় লাগে। তার মনে বৈধব্যের সংস্কারটাও তো প্রথম থেকে এমন প্রবল ছিল না যাতে সে এমনভাবে নিজেকে বিবিক্ত রাখতে পারে বা অপর পুরুষের প্রেম গ্রহণ করতে ভয় পায়। অথবা বিগত স্বামীর প্রেমস্মৃতিও তার অন্তরে উজ্জ্বল নয় যাতে মিলনের বাধা এসেছে অন্তরের দিক থেকে। বরং বিহারীর জন্য তার সমগ্র সত্তা উন্মুখ হ'য়ে আছে এটাই দেখি গ্রন্থের প্রথম থেকে। তবে কি লেখকের মনেই দ্বিধা ছিল?

'পয়লা নম্বর' গল্পটিতেও সিতাংশুর আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিলা সব ছেড়ে চ'লে গেল। ক্ষুব্ধ নারীহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব সমস্যার অবতারণায় বাংলা সমাজে নারী-জাগরণের প্রেরণা পরোক্ষভাবে এসেছে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে। সহজে যা পাওয়া যায় তার প্রতি নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা

দেখা যায়। বিনোদিনী মহেন্দ্রের আচরণে বীতশ্রদ্ধ, পরিশ্রান্ত। বিহারী-চরিত্রের কঠোর সংযমই বিনোদিনীকে আকৃষ্ট করেছে। তার আকাঙ্ক্ষা বাধা পেয়েছে নিজেরই অন্তর্নিহিত শোভনতা-বোধে। বিহারী ও বিনোদিনীর ব্যবধানে অতৃপ্ত প্রেমের বেদনামন্থর গতি বিনোদিনীকে কোনো সান্ত্বনার স্বর্গে উপনীত করতে পারে নি ব'লেই মনে হয়। কিন্তু এই বিচ্ছেদবেদনাতেই প্রেম হয়েছে ভাস্বর।

বাঙালীসমাজে চিরাচরিত আত্মীয়সম্বন্ধের মধ্যেও প্রেম কি-ভাবে জীবনকে সমস্যাসংকুল ক'রে তুলতে পারে সেই জটিলতাই 'নষ্টনীড়'-এর উপাদান। অমল ও চারুলতার মধ্যে যে-আকর্ষণ তাকে ব্যবহারিক অর্থে প্রেম আখ্যা দেওয়া যায় না, তারা নিজেরাও এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল না। অমল ও চারু কোনো অসংযম প্রকাশ করে নি কিন্তু তবু ভ্রাতৃজায়া এবং দেবরের সহজ সম্পর্ককে ছাড়িয়ে একটা নিগূঢ় মনোভাব, অহেতুক আকর্ষণ দু-জনেই প্রবলভাবে অনুভব করেছে। এর ফলে অমলের দ্বন্দ্ব জেগেছে দাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে চারুর প্রতি আকর্ষণে। অপরদিকে চারুর সমস্যা দেখা দিয়েছে স্বামিনিষ্ঠার সঙ্গে দেবরের প্রতি অহেতুক প্রবল আকর্ষণে।

"নৌকাডুবি"র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> প্রশ্ন হচ্ছে এই যে স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে, তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কোন একজন বিশেষ মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।

এই তত্ত্বটিই রূপায়িত হয়েছে কমলা-চরিত্রে। সূক্ষ্ম একটা তত্ত্বপ্রবণতা চরিত্রসৃষ্টির মূলে থাকলেও প্রত্যেকটি চরিত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কমলা, রমেশ ও হেমনলিনী কেউই কৃত্রিম নয়, অসাধারণত্বও কিছু নেই এই চরিত্রগুলির মধ্যে। এদের প্রেমে সমস্যা দেখা দিয়েছে অভ্যস্ত ধর্মবোধ ও সংস্কারের জন্যই। কমলা রমেশকে নিজের স্বামী মনে ক'রেই তাকে পাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে কিন্তু ছেঁড়া চিঠির টুকরো যখন কমলার কাছে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করল তখন সে অপরিচিত স্বামীর জন্যই রমেশকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত হিন্দু বালিকা কমলার মধ্যে প্রেমের ধারণা স্পষ্ট নয়, তার অন্তরে বদ্ধমূল সতীত্বধর্মের, স্বামিনিষ্ঠার সংস্কার। সেই কারণেই এখানে প্রেম প্রেমনিষ্ঠ নয়, স্বামিনিষ্ঠ। না হ'লে কমলার পক্ষে রমেশকে ভালোবেসে তার আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দু বালিকাবধূর পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য ব্যক্তিতে চিত্তস্থাপন ব্যভিচারেরই সমতুল্য। আবার সাধারণ নীতিজ্ঞানে পরস্ত্রী জেনেই রমেশ সম্পূর্ণভাবে কমলাকে গ্রহণ করতে পারে নি, কাছে থেকেও দূরে রাখবার কঠোর সংগ্রাম করেছে— যদিও শেষ পর্যন্ত কমলাকে গ্রহণ করতেই তার মন উন্মুখ ছিল।

বাগ্‌দত্তা হেমনলিনীর প্রণয় সুগভীর। ঘটনার অভিঘাতে তাকে দুঃখভোগ করতে হয়েছে রমেশ-কমলার সম্বন্ধের জন্য। হেমনলিনী সুশিক্ষিতা; সে দুঃখ পেলেও ক্ষোভে বিড়ম্বিত করে নি নিজেকে এবং প্রতিহিংসাকুটিল হয় নি রমেশের প্রতি। রমেশকে নিজের দিকে টানবার চেষ্টাও করে নি এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছে। সে বিনোদিনীর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। হেমনলিনীর কুমারীহৃদয়ের প্রেমে যে-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রপ্রেমের মৌলিক আবেগ সেই সংযম ও শোভনতার অনুরাগী।

বাংলার স্বদেশীযুগের পরিবেশে ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে গোরা-সুচরিতা ও বিনয়-ললিতার দেখাশোনা, মেলামেশা হয়েছে। মনের দ্বন্দ্ব, অপ্রকাশের ব্যথা, তৎকালীন সামাজিক বিঘ্নের মধ্য দিয়ে প্রণয়ীযুগলের কাহিনী বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। "গোরা" উপন্যাসে প্রেম "চোখের বালি"র মতো সমাজ ও আত্মবিরোধের সমস্যাপীড়িত নয়। হিন্দু-যুবক ও ব্রাহ্ম-কুমারীর প্রেমে সাময়িক আচারধর্মের বাধা উপস্থিত হ'লেও প্রেম এখানে চিরকালীন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সুচরিতা ও ললিতাকে কেন্দ্র ক'রে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রেমস্রোত প্রবাহিত, একটি ধ্যানগম্ভীর অন্যটি আবেগ-উদ্বেল। "গোরা" উপন্যাসে আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে সুচরিতা ও গোরার প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে। এ-প্রেম সংস্কারমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, সংযত, গভীর ও আত্মানুসন্ধানে উন্মুখ। হেমনলিনীর মধ্যে নারীরূপের যে-সৌষম্য দেখা দিয়েছে তারই পরিণত রূপ সুচরিতা। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমিকাই এই ধাতুতে গড়া। সুচরিতা, লাবণ্য, কুমুদিনী, এরা সগোত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্বে এরা ভিন্ন। স্বাজাত্য থাকলেও এদের নানা ধরনের সমস্যা ; মানসিক জটিলতা ও বৈচিত্র্যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এই স্থির, সুন্দর তাপসী মূর্তি কবির মানসপ্রতিমা। আর ললিতা, চঞ্চল সে, কিছুটা উদ্ধত-প্রকৃতি, কিন্তু সংকল্পে তার অটুট নিষ্ঠা। গোরা আদর্শ-উন্মাদ ত্যাগী পুরুষ। কিন্তু সেও প্রেমিক, মহৎ প্রেমিক। পুরুষের প্রেমে পৌরুষের দীপ্তি সঞ্চার ক'রে রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যের মস্ত বড়ো একটা অভাব মোচন করেছেন। গোরাও একদিন তার একাকিত্বের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারল এবং সেই আদর্শ পুরুষ পূর্ণতা পেল সুচরিতার প্রেমে। আদর্শ পুরুষ এবং নারী, যাদের বিচ্ছেদে নয়, মিলনেই কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হবে, তারাই মিলিত হয়েছে।

এই মিলনেই প্রেমের পূর্ণতা। এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মুখের কথাতেই বলা যাক—

তোমরা যাই বল মেয়েদের প্রধান কাজ inspire করা। পুরুষ বা মেয়ে উভয়েই অসম্পূর্ণ, উভয়ে মিলিত হলে একটা সম্পূর্ণতা আসে। জীবনে তার গভীর প্রয়োজনীয়তা।...পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে সবল দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না নারী তার অমৃত দিয়ে পূর্ণ করে তাকে।...যেখানে পুরুষ মহৎ যেখানে সে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাকে নিয়ত জাগ্রত করে রাখা কম কাজ নয়।[১]

গোরার কাছে সুচরিতার অভাবে একদিন সব বিস্বাদ ঠেকল। সে নিজের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করল, তার সমস্ত মন আকাঙ্ক্ষা করল নিজের সৃষ্ট অবরোধ থেকে মুক্তি। এবং সে-মুক্তি সুচরিতার মধ্যে। গোরা ও সুচরিতার মিলনে সর্বমানবীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উদার আনন্দে প্রেমকে নিত্যধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ এবং পরোক্ষভাবে ভবিষ্যৎ ভারতের মানসমূর্তি প্রত্যক্ষীভূত হ'য়ে থাকল। "নৌকাডুবি" বা "গোরা" উপন্যাসে প্রেমের পরিণতি বিবাহে হ'লেও এ-প্রেমের স্বরূপ চৈতন্যময়।

আচারধর্ম, সংস্কার ও নিত্যধর্মের বিরোধ 'দুরাশা' ও 'নামঞ্জুর' গল্পের ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে। আচারধর্মের কাছে প্রেম পীড়িত, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত এবং এই অবমাননা এসেছে প্রেমাস্পদের হাত থেকেই।

অসংখ্য কামনাবাসনার রঙ্গক্ষেত্র মানুষের দেহ, মানুষের মন। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নরনারীর বিচিত্র মনোভাব ও আচরণ প্রকাশ পায়। নবাব-নন্দিনী হিন্দু কিশোরলালকে ভালোবেসে

১ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় পর্ব। মৈত্রেয়ী দেবী

তার জন্য কুল, মান, ঐশ্বর্য সব ত্যাগ করল, সমস্ত জীবন ধ'রে তাকে পাবার সাধনা করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের সংস্কার টলাতে পারল না। এতে বেদনা ছিল কিন্তু ব্যর্থতাবোধ ছিল না, তার মোহভঙ্গ হ'ল তখনই যখন সে দেখল সেই ব্রাহ্মণ ভুটিয়া-স্ত্রী নিয়ে সংসার পেতেছে। তার জন্য কোনো সান্ত্বনা অপেক্ষা ক'রে নেই। জীবনব্যাপী তপস্যার এই মর্মান্তিক রিক্ততা ব্যর্থতা অনুভব করেছে নবাব-নন্দিনী :

হায় ব্রাহ্মণ তুমি তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবনযৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।

'নামঞ্জুর' গল্পের ট্র্যাজেডিও তাই। অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত শুনে তাকে বিবাহ করার আর স্পৃহা রইল না অনিলের।

"চোখের বালি"র মতো "চতুরঙ্গ"র প্রেমেও সমস্যা দেহতৃষ্ণা নিয়ে। মানুষের এই আদিমতম তৃষ্ণা সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। এক-একটি জীবদেহকে কেন্দ্র ক'রে সহস্র কামনা বাসা বেঁধে আছে। অন্তর্নিহিত এই রহস্যকে সত্যভাবে যাচাই করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমস্যামূলক উপন্যাস রচনা করেছেন। ভালোবাসার অবলম্বনের অভাবে দামিনীর অন্তর একমুহূর্তও শান্তি পায় নি। আধ্যাত্মিক চেতনাই জীবদেহের সকল অভাব পূরণ করতে সমর্থ নয়, তা হয়তো মনের কিছুটা পরিবর্তনসাধন করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার জৈবক্ষুধা ও আন্তরিক উচ্চাশা নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেই স্বভাবে সম্পূর্ণতা পায়। তার ব্যতিক্রম হ'লেই দেহমন অশান্ত পিপাসা ও দ্বন্দ্ব নিয়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে নিজের জীবন দুর্ভর ক'রে তোলে অথবা চূড়ান্ত অশান্তির সৃষ্টি করে। এই অবস্থা পুরুষ বা নারী কারো দিক থেকেই মঙ্গলকর সমাধান নয়।

পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসের একটি ভাবী দ্বন্দ্বের বীজ এখানে উপ্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে এই দ্বন্দ্বজটিলতা দেখা দিলেও লক্ষ্য এত নিশ্চিত যে, লালসার বহ্ন্যুৎসব বাধবার কোনো সম্ভাবনা নেই। দামিনী শচীশের পায়ে শেষ প্রণাম রেখে শ্রীবিলাসকে নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে। অবশ্য শ্রীবিলাস ও দামিনীর বিবাহ হ'লেও তাদের ঘরসংসারের সাধারণ বিবাহ নয়— এ-কথা রবীন্দ্রনাথ শ্রীবিলাসের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন।

শ্রীবিলাস বলেছে—

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে।

হ'তে পারে শেষ পর্যন্ত সে দামিনীই রইল, গৃহিণী হ'ল না। কিন্তু এই শুধু দামিনীত্ব বিবাহিত জীবনে প্রাত্যহিক সংস্পর্শে কতখানি সম্ভবপর তা বলা কঠিন। বোধ করি দামিনীর পরিণতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও নিঃসংশয় হ'তে পারেন নি এবং সেই কারণেই সমস্যাটি বিপরীত আকারে তাঁর শেষের দিকের কয়েকটি উপন্যাসে দেখা দিয়েছে।

বিবাহিত নারীর জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব এবং তার ফলে দম্পতির মানসিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক জটিলতা দেখা দিল "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে। নিখিলেশের ভালোবাসার আদর্শ বিমলা ততটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। একে নিখিলেশের নির্লিপ্ত প্রকৃতি, অন্য দিকে সন্দীপের উদ্দাম আহ্বান, এই দোটানায় সাধারণত যা হওয়া স্বাভাবিক, বিমলার মন টেনেছে সন্দীপ। স্বামীর নিষ্ক্রিয় উদারতা তাকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে সাহস দিয়েছে, তা ছাড়া সন্তানের বন্ধনও নেই যে বাৎসল্য

তাকে স্বামীর দিকে উন্মুখ ক'রে রাখবে। সুতরাং প্রবলের প্রতি নারীর যে স্বভাবগত আকর্ষণ, তার ফলে সহজেই সন্দীপের প্রতি বিমলাকে আকৃষ্ট করেছে।

আধুনিক সমাজজীবনের প্রসার, পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তাতে নারীজীবনে, স্বামী বর্তমানেও বিবাহিত নারীর জীবনে একাধিক পুরুষের প্রেমের আবির্ভাব ঘটতে পারে। স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব ছাড়াও নারীর একটি স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র মনুষ্যত্ব স্বীকার করেছেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ এই পরকীয়া প্রেমকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু এ-কথাও ভেবে দেখবার যে নারীকে আশ্রয় করতে হবে সংসার এবং সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধবন্ধেই তার সার্থকতা। এ-কথা শুধু নারীর পক্ষেই সত্য নয়, পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য। কেননা পরিণতবয়স্ক পুরুষ-নারীর ব্যক্তিগত জীবন বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বিবাহাতিরিক্ত প্রেম নারীর পক্ষেই হোক বা পুরুষের পক্ষে হোক, তার স্বীকৃতি মনে-মনে থাকলেই ভালো, না হ'লে সংসারে জটিলতা বেড়েই চলে, শেষ পর্যন্ত হয়তো বা সর্বনাশ ডেকে আনে।

নিখিলেশ ও সন্দীপকে নিয়ে বিমলার মানসদ্বন্দ্বের ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। কামনার দীপাধারে অগ্নিসংযোগ ক'রে মোহময় আলো শেষ পর্যন্ত জ্ব'লে উঠতে পারে নি, বিমলাকে নিশ্চিত সর্বনাশ থেকে পরিত্রাণ করেছে সন্দীপের অসারতা এবং সেই তুলনায় নিখিলেশের মহৎ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সন্দীপের নিকট থেকে বিমলাকে আড়াল ক'রেও নিখিলেশ-বিমলার পুনর্মিলনে মসৃণ দাম্পত্যজীবনের কাহিনী আর অনুসৃত হয় নি, বিমলাকে বাঁচতে হ'ল স্বামীকে হারিয়ে তার সুখস্মৃতি বুকে নিয়ে। দু-জনের পুনর্মিলনের ভূমিকায় আবার সেই পুরোনো মসৃণতা ফিরে আসে,

না। ভাঙা মন জোড়া দিতেই বাকি জীবন অতিবাহিত হয়— এই সংশয়ের মধ্যে বিমলা-নিখিলেশকে ফেলেন নি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ "সমাজ" প্রবন্ধ-গ্রন্থে এবং "যাত্রী"তে নরনারীর বিচিত্র এবং জটিল সম্পর্ক নিয়ে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের যে-ব্যাখ্যা করেছেন সেই চিন্তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিফলিত। পরিণত রবীন্দ্রদৃষ্টির যে-পরিচয় "পূরবী"-"মহুয়া"তে দেখা যায়, সেই কাব্যময় সৃষ্টির বাস্তব রূপায়ণ "যোগাযোগ" ও "শেষের কবিতা"। আধুনিকপূর্ব ও অত্যাধুনিক যুগের পটভূমিতে দাম্পত্য ও বিবাহ-পূর্ব দুটি প্রেমের কাহিনী "যোগাযোগ" আর "শেষের কবিতা"।

"রাজা ও রানী" নাটক, 'বোষ্টমী' গল্প ও "যোগাযোগ" উপন্যাস এই তিনটি প্রেমকাহিনীর বেদনার মূলে একটা যেন সূক্ষ্ম ঐক্য আছে। বিক্রমের সর্বগ্রাসী আসক্তিই সুমিত্রাকে পাবার পথে প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিল; সুমিত্রা রাজ্য, রাজগৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। এই ত্যাগের মূলেও অনুরাগ। বোষ্টমীর গৃহত্যাগেরও একটি অনুরূপ বেদনার কাহিনী আছে। যাকে সে গুরু ব'লে শ্রদ্ধা করেছিল, মুহূর্তের অনবধানতায় দেখল তার মধ্যে সুপ্ত পশুটা সজাগ হয়েছে। বোষ্টমী পথে বেরিয়ে পড়ল। পত্নী-প্রেমের সঙ্গে ভোগের যে সামাজিক দাবি আছে সেটা বৃহত্তর জীবনকে গ্রাস করলে প্রেমের যে দীন মূর্তি দেখা দেয়, সেই বিকারের প্রতি নারীমনের একটা তীব্র প্রতিবাদ আছে। কুমুদিনীর বিদ্রোহী রূপ প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে। কুমুদিনীকে সহধর্মিণীরূপে, দিবসের কর্মসহচরীরূপে মধুসূদন গ্রহণ করতে পারে নি। সর্বসুষমায় মণ্ডিত ব্যক্তিত্বশালিনী রমণীর রূপটিকে স্থূলদৃষ্টি মধুসূদন আবিষ্কার করতে অক্ষম হয়েছে ব'লেই কুমুদিনীর ব্যথা ও দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে বিদ্রোহ।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালও এই বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। মধুসূদন কুমুদিনীকে ঐশ্বর্যের দম্ভ দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে এবং ভোগের মধ্যেই একান্ত ক'রে পেতে চেয়েছে। কুমুর মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। কিন্তু এই বিদ্রোহ শান্ত হবে, কুমুদিনী আর মধুসূদনের দুটি বিরোধী হৃদয় ভাবী সন্তানকে আশ্রয় ক'রে সার্থক হবে এই আশ্বাস লেখক আমাদের দিয়েছেন। এখানেও দেখি পত্নী জননীতে পরিণতি পেয়েছে; কিন্তু এই উপন্যাসে বিবাহিত প্রেমেও দেহ ও মনের সুসংগতি নেই— কুমুদিনী মধুসূদনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কর্তব্য-বুদ্ধিতে। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আদর্শের সঙ্গে স্থূল কামসচেতনতার দ্বন্দ্ব এখানে সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের প্রায়-উপন্যাসেই দাম্পত্যপ্রেমে নানা জটিলতা এসে উপস্থিত হয়। "চোখের বালি", "ঘরে বাইরে"তে আমরা তা দেখেছি এবং শেষের দিকের রচনা "দুই বোন", "মালঞ্চ" প্রভৃতিতেও দেখতে পাব। রবীন্দ্রসাহিত্য-সংসারে কতগুলি নরনারী আছে যাদের দাম্পত্যপ্রেম মসৃণ ও মধুময়। পরস্পর-নির্ভর দাম্পত্যজীবনের মধুর চিত্র আছে 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'চোরাই ধন' প্রভৃতি ছোটোগল্পে। আবার পরিণতবয়স্ক নরনারীর মানসক্রিয়ায় যেমন নানা বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব দেখা যায় তেমনি সরল সুন্দর বালিকা-বধূর প্রথম প্রেমের উন্মেষের মাধুর্যও আছে। এই প্রসঙ্গে চঞ্চলা গ্রাম্যবালিকা মৃন্ময়ীকে প্রথমেই মনে পড়ে। বালিকাবধূ কল্পনায় এবং এই ধরনের অপরিণত কিশোরী-মনের প্রেমের চিত্রে মাধুর্য ও বাৎসল্যরসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কমলা, হেমনলিনী, সুচরিতা, ললিতা, এদের প্রথম প্রেমের অরুণোদয়ও অপূর্ব সুষমায় ফুটে উঠেছে।

আগেই বলেছি আধুনিক যুগের পটভূমিতে পরিণতবয়স্ক, শিক্ষিত, রুচিবান নরনারীর প্রেমের কাহিনী "শেষের কবিতা"

উপন্যাস। জটিল সামাজিক ও দাম্পত্যজীবনের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ প্রেম নয়, "শেষের কবিতা"র প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের আদিম লোভ এবং বঞ্চনা বা এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে-প্রেম পীড়িত নয়। "শেষের কবিতা"র প্রেমে কামনার স্থূলত্ব নেই। "পূরবী"-"মহুয়া"য় নির্বন্ধন প্রেমের যে-ভাবরূপ প্রকাশ পেয়েছে "শেষের কবিতা" তারই বস্তুরূপ। অমিত রায় প্রেম এবং ভালোবাসার মধ্যেও সূক্ষ্ম ভেদরেখা টেনেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে-দ্বন্দ্ব বার-বার দেখা দেয়—সেই প্রেম ও বিবাহের সমন্বয় বা মানবী ও মানসীপ্রিয়ার সমন্বয়ে প্রেমের পূর্বাপর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কিনা এর একটা মীমাংসা "শেষের কবিতা"য় পাওয়া যায়। পরিণত রবীন্দ্রনাথের ধারণা বোধ করি এই যে, ভালোবাসার অনিবার্য ফল যে বিবাহ হ'তেই হবে এমন কথা নয়। পরিণতি বিবাহ হ'লে ভালোই, নইলে জোর ক'রে মেলাবার দরকার নেই।

মানসী আর মানবীকে একই নারীতে পাওয়া সম্ভব নয় ব'লেই বোধ করি প্রতিদিনের নিবিড় সংস্পর্শে লাবণ্যের যে অনির্বচনীয় রূপ অমিত আবিষ্কার করেছিল তা আর খর্ব হবার সম্ভাবনা রইল না। লাবণ্য ও অমিত দু-জনেই দু-জনের মানসে রইলো। এদিকে কেটি ও অমিত এবং লাবণ্য ও শোভনলালের বিবাহবন্ধন দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা হ'ল। রবীন্দ্রনাথ যে চিরকৌমার্যকে স্বাভাবিক এবং সামাজিক ব'লে মনে করতেন না তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। "গোরা" পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রেমে প্রিয়ার পরিণতি হয়েছে বিবাহিত পত্নীতে এবং শেষের দিকের রচনাগুলিতে সমন্বয়ের চেষ্টা থেকে স্বতন্ত্র উপলব্ধির পরিচয়ই বেশি।

লাবণ্যর সুপ্ত নারীপ্রকৃতিকে ঘুম ভাঙিয়েছে অমিতের সোনার

কাঠির স্পর্শ, আর লাবণ্যর প্রেমের অরুণালোকে নিজেকে বেশি ক'রে চিনেছে অমিত। এই শান্ত সুন্দর প্রেমের মধ্যে বিরহের অনিবার্যতা এসেছে তাদেরই অন্তর্নিহিত স্বভাবের মহিমায়। অমিতের যে-শিল্পীসত্তা বৈচিত্র্যের উপাসক তাকে লাবণ্য ঠিকই বুঝেছিল তার ভালোবাসার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, তাই তাকে প্রতি-দিবসের সান্নিধ্যে আনতে সে নিজেও চায় নি। এই ত্যাগ খুব বড়ো ক'রেই লাবণ্যর বুকে বেজেছে, কিন্তু প্রেমময়ী কল্যাণী নারী নিজের সুখের চেয়ে বড়ো ক'রে দেখে প্রেমাস্পদের মঙ্গল। লাবণ্যর ভয়, যদি প্রাত্যহিক নিবিড়তম ভালোবাসার বাঁধন অমিত সইতে না পারে, যদি তার বৈচিত্র্যসন্ধানী মন লাবণ্যর প্রাত্যহিক সান্নিধ্যে আর নতুনত্ব না পায়, যদি পীড়িত হয়? সে-ব্যথা লাবণ্য সহ্য করতে পারবে না; তার চেয়ে এই ভালো, প্রেমোজ্জ্বল ক্ষণগুলি চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকবে। দূর থেকেই সে হবে অমিতের মানস-সঙ্গিনী। এই ব্যবধানের দ্বারা একদিকে লাবণ্য মুক্তি দিয়েছে অমিতের শিল্পী প্রেমিকসত্তাকে, অপরদিকে শোভনলালের মন থেকে কাঁটাটুকু দূর ক'রে দিয়েছে তার প্রেমকে গ্রহণ ক'রে। জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা চিত্তের সংকীর্ণতা দূর হয়েছে লাবণ্যর। তার প্রেমে পরিণত শিক্ষা ও গভীর আত্মোপলব্ধির দীপ্তি দেদীপ্যমান। অমিতকে সব চাইতে আকৃষ্ট করেছিল লাবণ্যর পুরুষোচিত মননশীলতা, তার ব্যক্তিত্ব। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে মুক্তিচেতনায় এ-নারী মননশীল পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী। কিন্তু সে-ও চিরন্তন কেন্দ্রাভিগ-শক্তিরূপিণী নারী। সেই কারণেই তার ঘর বাঁধবার অবলম্বন চাই। শিল্পী-প্রেমিক অমিতকে লাবণ্য ভালোবেসেছে সর্বান্তঃকরণে, কিন্তু প্রতিদিবসের সঙ্গীরূপে বেছে নিয়েছে তাকেই, যে তার মধ্যে পূর্ণতার আদর্শ শুধু খুঁজবে না, ভালো-মন্দ সব-কিছু মিলিয়ে তার যে-রূপ তাতেই

তৃপ্ত হবে। সেই সাধারণ মানুষটির সেবা করার ব্রত নিল লাবণ্য।

যে-পুরুষের মন নীড়বিবাগী সে লাবণ্য বা কেটি কাউকে একান্ত ক'রে পেয়েও হয়তো সুখী হবে না। তার ভালোবাসা বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ততখানি নয় যতখানি সেই ব্যক্তির ভালোবাসার প্রতি। বন্ধনমোচনের আনন্দ শিল্পীর রক্তে মিশে আছে। অমিত নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে, সান্ত্বনা খুঁজেছে। অমিত বলে—

কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করবো। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইলো দীঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।

বিবাহ সত্য, প্রেমও সত্য। কিন্তু বিবাহ-অতিরিক্ত যে-প্রেম তার স্থান মনে। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়—একই সঙ্গে নিত্য-ব্যবহারের জন্য ঘড়ায় তোলা জল আর দীঘির জলে সাঁতার দেওয়ার কল্পনা বিবাহিত জীবনে কতখানি সার্থক হবে বা সে-কল্পনার অবকাশই বা কত, বলা কঠিন। সংসারজীবনে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের কেবলই জট পাকিয়ে ফেললে জীবন দুর্ভর হবে না কি? তা ছাড়া দূর প্রেমস্মৃতি শুধু ক্ষীণতম ব্যথা জাগানো ছাড়া আর কি তীব্রতা রাখবে? প্রতিদিনের ব্যবহারিক সংস্পর্শে এবং ভালোবাসার মূল্যায়নে অমিত আর লাবণ্যর হৃদয় বেশির ভাগই জুড়ে থাকবে কেতকী আর শোভনলাল। তখন 'একমাত্র তুমিই আমার' বলবার অবকাশ কোথায়? লাবণ্যর প্রত্যয়ই সত্য। লাবণ্য-শোভনলাল ও অমিত-কেতকীর বিবাহের পরে অমিত-লাবণ্যর জীবনে সম্ভাব্য সত্য এই—

শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

লাবণ্য অমিত এরা সাধারণ হ'য়েও অসাধারণ। অমিতের প্রেমের সঙ্গ-আসঙ্গের আদর্শ বিশেষ ব্যক্তিজীবনে সাফল্য ও মাধুর্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। বৈশিষ্ট্যময় মনোভূমিতে এই প্রেমের ভিত্তি, সাধারণের পক্ষে এর সিদ্ধি সম্ভব নয়। এবং কেটি-অমিতের মিলিত জীবনে অমিতের পক্ষে প্রেমের সঙ্গ-আসঙ্গের আদর্শ বজায় রাখা কতখানি সম্ভব তা ভেবে দেখবার।

অমিত তার 'সঙ্গ'-'আসঙ্গ'-কল্পনায় স্বয়ং স্রষ্টার বিশিষ্ট ধারণা-ভাবনার অংশীদার হ'য়ে পড়েছে যদিও অমিতকে ততখানি পৌরুষ কবি দিতে পারেন নি। অমিতের চেয়ে বরং লাবণ্য রবীন্দ্র-মানসের মৌন তূষ্ণীম্ভূত প্রেমের যোগ্য আধার। যা রবীন্দ্রমানসে সহজ, জগতে খুব স্বল্প লোকের পক্ষেই তা অনুশীলন করা সম্ভব নিজের জীবনে।

তাই, প্রেমের সেই শিল্পীসত্তা অমিতের মধ্যে সম্যক জাগ্রত কি না সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এ-ছাড়া কেটির এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর ক'রে চোখের জল যখন গড়িয়ে পড়তে পেরেছে, তখন, বিবাহের পর, অমিত যে অবসরে অনবসরে লাবণ্যকে স্মরণ করবে, তা সে সহ্য করতেই পারবে না। কাজেই অমিত সঙ্গ-আসঙ্গের যে-কথা বলেছে তা না হ'য়ে এ প্রেমের উপসংহার অন্যরকম হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

সামাজিকভাবে নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর প্রেমের শুচিসুন্দর রূপ ও উচ্চতর মানসক্রিয়া "শেষের কবিতা"য় যে-ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, সেই মানসিক তৃপ্তি সকলকে আশ্বস্ত না-ও করতে পারে। সকলের পক্ষে ঐ আদর্শ অনুসরণ যদি সম্ভব না হয়? তখন কি সমস্যা দেখা দেবে, কোন ব্যর্থতা বহন ক'রে আনবে সে-প্রেম?

"শেষের কবিতা"য় চিত্রিত নর-নারীদের কোনো পূর্বসংস্কার নিয়ন্ত্রিত করে নি : তাদের প্রেমে সমস্যা পূর্বরাগের, বিবাহপরবর্তী

নয়। তবু তারা কোনো ভাঙন ধরায় নি। তারা তাদের স্বাধীন চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি, সংযত ও শিক্ষিত মন দিয়ে নিজেদের জীবনের নিষ্কলুষ পথ বেছে নিয়েছে।

প্রেমের সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি পরিণত বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাসাহিত্যে নারীর প্রেমে এই পরিণত রূপ দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখীতে ব্যক্তিত্বের আভাস আছে বটে কিন্তু তার অভিমানী প্রেমে পরিণত শিক্ষা ও গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের সুর বাজে নি।

সংসারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুটি নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আর-একজন ছায়া ফেললেই তাদের মনের ভারসাম্য বিচলিত হ'তে বাধ্য। এবং এই ত্রিকোণ প্রেম সংসারে মসৃণভাবে এগিয়ে চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে না তার উদার প্রসন্ন সমাপ্তি— প্রণয়ীত্রয় অবিবাহিত হ'লেও নয়। আর, বিবাহিত হ'লে তো জটিলতা অনিবার্যভাবে আসবেই। বয়স্ক মানুষ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ওতপ্রোতভাবে। তাদের জীবনের বিশৃঙ্খলা শুধু তাদেরই আঘাত করে না, সামনে পিছনে জড়িয়ে আছে এমন অনেককে সেই দুঃখের ভাগী হ'তে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্য-সংসারের যে-সব নরনারীর জীবনে এই ধরনের জটিলতা দেখা যায় তারা অন্তত একটা কঠিন সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সেটা হ'ল, সন্তানস্নেহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে নি তারা।

“দুই বোন” ও “মালঞ্চ” উপন্যাসে শর্মিলা ও নীরজার বিবাহিত জীবনে বহুদিন পরে সমস্যা দেখা দিল। স্বামীর সঙ্গে তাদের বন্ধন সন্তানের দ্বারা দৃঢ় হ'লে হয়তো এমন না হ'তেও পারত। কিন্তু যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য নয়, অথবা এমন হ'তে পারে না তা-ও বলতে পারি না। শর্মিলার স্বামী শশাঙ্ক আর

নীরজার স্বামী আদিত্য দু-জনেই স্ত্রীর ভালোবাসায় তৃপ্ত না থেকে অন্য নারীকে ভালোবাসল। তাদের দু-জনের সঙ্গেই আত্মীয় সম্পর্ক এবং স্ত্রীর অসুস্থতার উপলক্ষে, সুযোগেই বলা যেতে পারে, এদের প্রেম ঘনিয়ে উঠল।

কিন্তু দাম্পত্যজীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব কি নারী, কি পুরুষ কেউই সহ্য করতে পারে না। সামাজিকভাবে পুরুষের বহুবল্লভতা স্বীকৃত ছিল এবং এখনো স্বীকৃত, শুধু নারীর কাছেই সমাজ একনিষ্ঠা দাবি ক'রে এসেছে। কিন্তু নারীর পক্ষেও একাধিক পুরুষকে ভালোবাসা সম্ভব ব'লে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন শ্রদ্ধার সঙ্গেই।

শশাঙ্ক ও শর্মিলা এবং আদিত্য ও নীরজার বিবাহিত জীবন প্রথম থেকেই অসুখী ছিল, বা উভয়ে উভয়ের দ্বারা পীড়িত হচ্ছিল, এমন আভাস আমরা পাই নি। শর্মিলা মাতৃহৃদয়া নারী। কিন্তু পুরুষের মন সব সময় নারীর সেবা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারে না, তার আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে লীলাময়ী নারীর হ্লাদিনী শক্তির জন্য। প্রেয়সী নারী ও কল্যাণী নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণের এই তত্ত্বটাই রূপ দিতে বোধ করি রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাস রচনা করেছেন। নারীর প্রেমের এই দুটি দিক অনেক সময় একই নারীর ভিতর দিয়ে, কখনো বা পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা যে-পরিণতি লাভ করে এবং নতুন রূপ নেয় সে-পরিণতি "দুই বোন" ও "মালঞ্চ" উপন্যাসে নেই। "বীথিকা" কাব্যগ্রন্থের 'দুঃখী' কবিতায় এই মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে—

দুই জন পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।

দুজনার অসংলগ্ন মনে
ছিদ্রময় যৌবনের তরী
অশ্রুর তরঙ্গে ওঠে ভরি ;
বসন্তের রসরাশি সেও হয় দারুণ দুর্বহ
যুগলের নিঃসঙ্গতা নিষ্ঠুর বিরহ।

সন্তান না থাকলে স্ত্রীর ভালোবাসা বিশেষ ক'রে স্বামীকেই আঁকড়ে ধরে। হয়তো সেইজন্যই শশাঙ্ক ও আদিত্য অন্তরে-অন্তরে পীড়িত হ'য়ে উঠেছিল এবং ঊর্মি বা সরলা সহজেই তাদের মনে দোলা দিয়েছে ; রুগ্না স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তাদের মনে একটুও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সঞ্চার হয় নি। আশ্চর্য এই চরিত্র দুটির মূঢ়তা ও দীন স্বভাব। আর ঊর্মিও এমন মেয়ে যে, নিজের সহোদরার প্রতিও তার কোনো মমত্ববোধ প্রকাশ পেল না, স্বচ্ছন্দে দিদির স্বামীটির সঙ্গে প্রেম ক'রে বসল। অথচ সে এ-বিষয়ে অচেতন নয়, শিক্ষা সংস্কৃতি রুচি কোনো দিকেই তার ঘাটতি নেই। এমন নিষ্করুণ উচ্ছলতা কি ক'রে সম্ভব, ভাবতে গেলে বিস্মিত হ'তে হয়। শর্মিলার সর্বংসহা প্রকৃতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগালেও মাঝে-মাঝে সন্দেহ জাগে কেমন ক'রে সম্ভব এত সহ্য করা। অবশ্য স্রষ্টা শর্মিলার প্রতি নিষ্ঠুর হন নি। শেষ পর্যন্ত ঊর্মিমালার অপসারণে আবার দম্পতির পুনর্মিলন হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি বড়ো কথা এই যে, প্রেমের আশ্রয় দরকার। পুরুষ বা নারী যে-ই হোক তাকে আশ্রয়ে ফিরতে হবে এবং দুঃখভোগ তার অনিবার্য। মহেন্দ্র, বিমলা এদের ফিরতে হয়েছে। শশাঙ্কও ফিরে এল শর্মিলার কাছে, কিন্তু তার মনে দ্বন্দ্ব-জড়িত সমস্যা বা দুঃখ কোনোটারই প্রকাশ ঘটল না। শর্মিলাই ত্যাগের দ্বারা স্বামীর সুবুদ্ধি ফিরিয়ে এনেছে, যদিও তার বাকি জীবন প্রণয়ীপরিত্যক্ত স্বামীর ভাঙা মন জোড়াতালি দিতেই

কেটেছে। এর বেদনা এবং নীরব শাস্তি বেশি ক'রে তাকেই ভোগ করতে হবে। পরিণতবয়স্ক বিবাহিত পুরুষের প্রণয় সংসারে ভাঙন ধরিয়ে দেয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিলেও স্বামী-স্ত্রীর পূর্বেকার সহজ মধুর সম্পর্ক আর বজায় থাকতে পারে না।

শর্মিলার স্বাভাবিক ঔদার্য, অসীম ধৈর্য ও মহত্ত্ব এবং উর্মিমালার শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নেবার ক্ষমতাটুকু অন্তত শশাঙ্ক-শর্মিলার জীবনে নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটতে দেয় নি।

কিন্তু প্রবৃত্তি যে মানুষকে কিভাবে বিবেকহীন অ-মানুষ ক'রে তোলে তার উদাহরণ আদিত্য। শশাঙ্ক বা আদিত্য কারো আচরণই সমর্থনযোগ্য নয়। যদিচ শশাঙ্ক ও উর্মিকে অনুকম্পা করা যায়, আদিত্য-সরলার নির্দয়তা সহ্য করা কঠিন।

নীরজার জন্যে সত্যিই খুব দুঃখ হয়। তার অভিমান, বেদনা আদিত্য বোঝে নি। সে ব্যাকুলভাবে সংসারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে কিন্তু বোধ হয় আদিত্যর নিষ্ঠুরতাই তার মৃত্যুকে নিকটতর করেছে এবং নীরজা মারা গেল অপরিসীম তিক্ততা নিয়ে। মৃত্যুপথযাত্রী নীরজার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাই জাগে না, শুধু জাগে অনুকম্পা।

বিবাহিত জীবনে প্রেম থাকে পরস্পরনির্ভর হ'য়ে ; নির্বিচারে একজনের অন্যজনকে দুঃখ দিতে বাধে, বিশেষ ক'রে যদি সে-বন্ধন হয় ভালোবাসার। আদিত্য ও নীরজার দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে প্রেম অক্ষুন্ন ছিল। সুতরাং হৃদয়নীতির দোহাই এবং পুরুষচরিত্রের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যপিপাসা মেনে নিলেও আদিত্য কি ক'রে এমন মূঢ় এবং অবিবেচক হ'তে পারল সেটাই আশ্চর্য। নীরজা তার মৃত্যু সন্নিকট জেনে যখন ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল, একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না ? বল আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ···।

আদিত্য উত্তর দিল, যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর, আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোই নি।

নীরজার প্রেমের উপসংহারে কোনো সান্ত্বনার আশ্বাস নেই। এই প্রসঙ্গে 'মধ্যবর্তিনী' ও 'দৃষ্টিদান' গল্প দুটি মনে পড়ে। 'দৃষ্টিদান' গল্পটিতেও স্বামীর বিবেকহীনতা চরমে উঠেছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে স্ত্রীর কাছেই ফিরেছে।

নীরজার শেষ ঈর্ষা, ক্ষোভ সরলাকে বিদ্ধ করতে চাইলেও তার আসল স্বরূপ, অবিবেচক নিষ্ঠুর স্বামীর প্রতি উৎক্ষিপ্ত ধিক্কার।

বিবাহিত জীবনে প্রণয় এলে সমস্যা কিরকম হয় এবং সর্বনাশা ভাঙনও যে কেমন ক'রে অনিবার্য হ'য়ে ওঠে তারই কাহিনী 'নষ্টনীড়', "চোখের বালি", 'মধ্যবর্তিনী', "ঘরে বাইরে", "দুই বোন", "মালঞ্চ" প্রভৃতি।

মানুষের জীবন পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতে অনেকখানি জটিল হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—

নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয়, চারিদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ আর একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র বৈশিষ্ট্য।[১]

জীবনের পূর্ণতার প্রয়োজনে প্রেম অপরিহার্য, এবং ভালো-বাসাই নারীর ধর্ম ; আধুনিক যুগে হয়তো বা তার ভালোবাসা

১ চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪২

একব্যক্তিনিষ্ঠ না হ'তেও পারে। সৃষ্টির প্রয়োজনেই উদাসীন পুরুষকে কেন্দ্রাভিগ শক্তি দিয়ে বাঁধা চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নারীর মোহিনীশক্তি দিয়েও 'বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া' থেকে অতীন্দ্রকে উদ্ধার ক'রে ঘরে আনতে পারল না, বোধ করি এইটাই এলার প্রেমের চরম বেদনা। শুধু মন দেওয়া-নেওয়া নয়, দেহের প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষার উন্মত্ততায় প্রেমের যে একটি ভীষণ-মধুর দিক আছে সেটিকেও কবি আর অবহেলা করতে পারেন নি। 'উর্বশী', "চিত্রাঙ্গদা"য় যে-সংরাগের আভাসমাত্র আছে, "চোখের বালি", "ঘরে বাইরে", "চতুরঙ্গ", "যোগাযোগ", "দুই বোন" ও "মালঞ্চে" সেই অনিবার্য আকর্ষণ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। সেই শাশ্বত কামনার নিরাবরণ দাবি এলা-অন্তুর প্রেমে। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী আরও দুঃসাহসী।

রবীন্দ্র-মনোলোকের ন্যায় রবীন্দ্রপ্রেম-দর্শনও আলোছায়ার বিচিত্র স্তরপরম্পরায় উপনীত হয়েছে পরিণামে। রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যের বিভিন্ন নারীচরিত্রগুলির ব্যাখ্যা করলেই এই পরিণাম-অভিমুখী ক্রমপর্যায় স্পষ্টতর হয়। প্রেয়সী নারী, কল্যাণময়ী জননী নারী এবং তদতিরিক্ত ব্যক্তিত্বময়ী মাধুর্যময়ী রমণী—নারীর এই সর্বাঙ্গীণ রূপই রবীন্দ্রসাহিত্যে মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু প্রেয়সী না হ'য়েও, জননী না হ'য়েও নারীর নারীত্ব প্রকাশ পেতে পারে এবং এই নারীত্বের বিকাশে রমণী মহীয়সী হ'তে পারে। সে-নারীত্ব প্রচলিত অর্থে স্বামিনিষ্ঠা বা সতীত্ব নয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতি নিষ্ঠা এই অভিনব নারীত্ব-শক্তির মহিমা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর এই অভিনব রূপ প্রকাশ পেয়েছে সোহিনী-চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে ব্যক্তি-আদর্শ, সমাজ-সমস্যা, মানবের অনন্ত তৃষ্ণা ও অতৃপ্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শাশ্বত ভোগরাগের উজ্জ্বলতম স্বরূপ সৃষ্টি করলেন সোহিনীতে। ত্যাগের

ক্ষৌমবস্ত্রে তাকে আবৃত করেন নি ; দুর্জয় তার ভোগ-স্পৃহা, প্রখর বুদ্ধি, দেহের শুচিতার সে ধার ধারে না। তার জ্বলন্ত সৌন্দর্যের কাছে মধুমত্ত মক্ষিকার মতো যদি পুরুষরা ঘুরে মরে তো মরুক, সে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার নিষ্ঠা বুদ্ধির কাছে, কর্মের কাছে। তার ইচ্ছাশক্তির জয় অনিবার্য, কথার খেলাপ সে করে না।

উপন্যাসে পরিণাম-রমণীয় যে-আদর্শে প্রেমকে পরিচালিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি পেয়েছিলেন, "গোরা"-পরবর্তী রচনায় এবং শেষের দিকে সে-আদর্শ স্বতন্ত্র পরিণাম সূচিত করেছে। এই কারণেই রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যবিচারে "দুই বোন", "মালঞ্চ" এবং "তিনসঙ্গী"র গুরুত্ব কম নয়। বিনোদিনী, শ্যামাসুন্দরী, শ্যামা— এদের ব্যর্থতার গ্লানি প্রত্যক্ষ। কিন্তু সোহিনী এদের সকলের ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

প্রচলিত অর্থে সোহিনী আর নন্দকিশোরের মধ্যে সম্বন্ধ-বন্ধের দায় নেই। সেই কারণে কায়মনোগত নিষ্ঠারক্ষারও দায় নেই। সোহিনীর ব্যক্তিনিষ্ঠা না থাক, ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা আছে। সোহিনীর পূর্ব-ইতিহাসটুকু বাদ দিয়ে ধরলে এই নারীত্ব আমাদের সমাজে এখন আর অবাস্তব বা অবান্তর ব'লে বোধ হয় না। পতির প্রেম না পেয়ে জননীপদে অভিষিক্ত হয় নি এমন নারী সংসারে বিরল নয়। কিন্তু সেই কারণেই সে ব্যর্থ এমন কথা বলবে কে ?

৫ ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র

. . . .

ভারতীয় জীবন-দর্শনে দুঃখের স্থান সংকীর্ণ। যেমন আমাদের দর্শনতত্ত্বে তেমনি আমাদের সাহিত্যেও আত্মার মৃত্যুহীন ভাবনা পরম আশ্বাসে জীবনের বাস্তব দুঃখানুভব থেকে আমাদের নিরস্ত করেছে। জীবন-সম্ভোগ এবং সম্ভোগের অপূর্ণতাজাত দুঃখবোধের তীব্রতা আমাদের সাহিত্যে মুখ্য স্থান পায় নি। এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, জীবনযুদ্ধে পৌরুষের মহিমা, নরনারীর দেহমনের যাবতীয় প্রবৃত্তি, তার বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেভাবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের উপজীব্য ও অবলম্বন, আমাদের সাহিত্যে তা নয়। ভারতীয় সাহিত্যে এই জীবন-সংগ্রামে উদ্দীপ্ত পৌরুষ-মহিমাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা হয় নি। সেখানে সনাতন ধর্মবোধ ও সমাজ-অনুশাসনের বিধিবিধানই বিদ্যমান ও বলবান। গ্রহণের শক্তিমত্তার চেয়ে ত্যাগের ভস্ম-আচ্ছাদনে মানবচরিত্র কতখানি মহৎ হ'য়ে উঠতে পারে, শ্রদ্ধা এবং মুগ্ধতা নিয়ে তাই দেখেছে ভারতবর্ষ। এই কারণেই বুঝি প্রবৃত্তির পুরুষকারকে বড়ো ক'রে অনাসক্ত চিত্তে জৈব প্রকৃতির দুর্বার শক্তি ও বিচিত্র লীলা লক্ষ্য করা সম্ভব হয় নি তার পক্ষে।

বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের কাব্যে আমরা প্রথম পাশ্চাত্ত্যের

এই প্রখর জীবননিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি। বঙ্কিমসাহিত্যেও সম্ভোগ-তৃষ্ণার অজস্র দীপ্তশিখা জ্ব'লে উঠেছে। কিন্তু বঙ্কিম-চিত্তের ভারতীয় মানসিকতা ও ইয়োরোপীয় জীবনবোধের বেগ এবং এই দুয়ের দ্বন্দ্বমুখরতায় তাঁর সাহিত্যে মানুষের কামনার সুরভি ও ব্যর্থতার নিরাশ্বাস দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে সনাতন ধর্মবোধ।

প্রকৃতির চক্রান্তে পুরুষ এবং নারীর জীবনে পরস্পরের প্রতি অনিবার্য কামনা জেগে ওঠে। নারীর সৌন্দর্যরস-সুধায় পুরুষ চায় জীবনকে ভোগ করতে। নারী চায় বাহুবন্ধনে ধরা দিতে। বঙ্কিম-প্রেমসাহিত্যে নারীর মোহিনীরূপ পুরুষকে বিহ্বল করে; তার ব্যক্তিত্বের গর্ব চূর্ণ হ'য়ে যায়, জ্ব'লে ওঠে দাবানল— সমাজ সংসার সব দগ্ধ করে; নারী নিজেও তা থেকে অব্যাহতি পায় না। নারীর সঙ্গে যুদ্ধে এই যে আত্মসমর্পণ, এই দেহনিয়তির কাছে পুরুষের পরাজয় ও অসহায়তা দেখে করুণা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরও এই রূপমোহ থেকে নিষ্কৃতি নেই। তার উদাহরণ— চন্দ্রশেখর, সন্ন্যাসী ভবানন্দ। চন্দ্রশেখর যখন নবাবগৃহ থেকে বাড়ি ফিরছেন তখন শৈবলিনীর কথা মনে হ'ল। তিনি উৎফুল্ল হলেন; তাঁর কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা ব্যর্থ হ'ল, তিনি বুঝলেন মহাভ্রমে পড়েছেন, তথাপি এই ভ্রম থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা হ'ল না। তেমনি ভবানন্দ অসংযমের ফল আত্মবিসর্জন জেনেও ধর্ম জলাঞ্জলি দিলেন।

"বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" এই তিনখানি গ্রন্থকে অবলম্বন করলেই বঙ্কিমসাহিত্যে লৌকিক প্রেমের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যাবে। তিনটি উপন্যাসেই বিবাহের পরে কখনো পুরুষের দিক থেকে, কখনো নারীর দিক থেকে সামাজিকভাবে নিঃসম্পর্কিত নরনারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হওয়ায় দাম্পত্য-

জীবনে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক ও সনাতন নীতিবোধ।

মানুষের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিণতি সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটি বিশেষ মনোভাব থাকলেও বিড়ম্বিত মানুষের প্রতি তাঁর অনুকম্পা যে একেবারেই ছিল না, তা বলা যায় না। তিনি "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ বলেছেন—

এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র রূপমোহকে রিপুর প্রাবল্য বলেছেন এবং প্রেমকেও রূপমোহের মতো একই কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত ব'লে দেখিয়েছেন। তিনি তুলনায় পরীক্ষিত সামাজিক দাম্পত্যবন্ধনেরই জয়গান গেয়েছেন। সেই প্রেমই তাঁর আদর্শ। পূর্বরাগের ঔজ্জ্বল্য থাকলেও যদি তা বিবাহে পরিসমাপ্ত হয় তবেই তা আদর্শ ব'লে গৃহীত হয়েছে। অন্যথায় সমাজ-ধর্ম যেখানে সেই মিলনের অন্তরায়, সে-ক্ষেত্রে তিনি পূর্বরাগকে পূর্বরাগেই ক্ষান্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি যা-ই বলুন বা যে-আদর্শকেই সচেতন সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, রূপরচনায় তার বিপরীতই ঘটেছে। প্রেমের পরিসমাপ্তিকে বঙ্কিম কি কোনো সুখকর সান্ত্বনায় নিয়ে যেতে পেরেছেন? প্রেম না মানে পাণ্ডিত্য, না মানে প্রজ্ঞা। মানুষের জীবনে যখন আসে তার হাতছানি, দুর্বার চুম্বকের আকর্ষণে ধরা দিতেই হয়। তখন তার কাছে তুচ্ছ বৈরাগ্য, তুচ্ছ জ্ঞানের শুষ্ক কাঠিন্য। তাই সব ভস্মীভূত করেছে চন্দ্রশেখর তার প্রেমের কাছে। কী দারুণ ট্র্যাজেডি, প্রেম এল জীবনে কিন্তু রইল না সে প্রেমাস্পদ! অদ্ভুত বলিষ্ঠ অথচ

বেদনাহত চরিত্র চন্দ্রশেখর। আর, প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমে কি শুধু কামনাই ছিল? ঘর সংসার স্বামী সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে প্রেমাস্পদের জন্য সে যে পথে বেরিয়ে পড়েছিল সে কি শুধু দুর্বার দেহতৃষ্ণায়? যে-প্রতাপ 'মরিতে যাইতেছি' ব'লে যুদ্ধক্ষেত্রে চ'লে গেল, তার আকাঙ্ক্ষাও কি কেবলই রূপের? অভিশপ্ত অর্ধচেতন বাল্যপ্রণয়ের চপলতা কি শান্ত সংযত অভিজ্ঞ প্রেমের প্রৌঢ়-দীপ্তি লাভ করে নি? প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই প্রতাপের আত্মবিসর্জন। শৈবলিনীর সাংসারিক ও মানসিক শান্তিরক্ষার মানসেই প্রতাপের মৃত্যুবরণ। এ প্রতাপের পরাজয় নয়। প্রেমের প্রতিষ্ঠা অন্তরের মণিকোঠায়। হৃদয়ধর্মকে স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও তাকে প্রতিষ্ঠা দেন নি বঙ্কিম। স্বভাব ও সমাজের দ্বন্দ্ব যে মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য অপহরণ ক'রে মহত্তর সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়, বঙ্কিম নিশ্চয় সে-কথা বুঝেছিলেন এবং তা স্বীকার করতেও বাধ্য হয়েছেন। তা না হ'লে হীরা, মতিবিবি রোহিণীর ব্যর্থতার হাহাকার কখনোই মূর্ত হ'ত না। এই হতাশ্বাস পরিণতিকে সমাজের দণ্ড বলতে মন চায় না। কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, প্রতাপ, মোবারক, রোহিণী— এদের মৃত্যু বা প্রেমের পরিসমাপ্তিতে কোন পার্থিব মঙ্গল ঘটল, কার জীবনেই বা সফলতা এল? যাকে বা যাদের ঘিরে আবর্তন শুরু হয়েছিল সেখানে আর শান্তি ফিরে আসে নি— আসা সম্ভব নয় ব'লে।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ধর্মের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি সমাজধর্ম লঙ্ঘন ক'রে স্বভাবধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। নর-নারীর আশ্রয় সমাজ। শিল্পীও সামাজিক মানুষ। সুতরাং সমাজ-চৈতন্য তাঁর থাকবেই। শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের দ্বন্দ্বের নিরসন

হয় না। এমন কোনো চূড়ান্ত আদর্শ সমাজ নেই যা প্রতি মানুষের মনের দাবি সম্যক পরিপূরণ করতে পারে। ব্যক্তির মনোধর্মের সঙ্গে সামাজিক নীতিবোধের বিরোধ থাকবেই। আবার প্রতি ব্যক্তির মানসক্রিয়া অপর থেকে এতই স্বতন্ত্র যে, দুটি হৃদয়ের গতি একই খাতে প্রবাহিত হ'লেও তালে তাল মিলিয়ে চলে না সব সময়। একটির সঙ্গে আর-একটির গরমিল অপরিহার্য এবং ভাঙাগড়ার অনিবার্য বেদনা বরণ করতেই হয়। আমাদের হৃদয় অপর থেকে বিচ্ছিন্ন, তাকে ঘিরে আছে অশ্রুর লবণসমুদ্র—

'And bade betwixt their shore to be
The unplumbed, salt, estraning sea.'

বঙ্কিমসাহিত্যে এই দ্বন্দ্ব বহন ক'রে এনেছে তীব্র ব্যর্থ পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের শেষ পর্যায়ে জীবনের চাহিদা রূপ নিয়েছে একটি স্বতন্ত্র পথে। সব ত্যাগ, মনস্বিতা, সম্ভ্রমবোধ, উদারতা— এই সমস্তকে ছাপিয়ে ওঠে মানুষের চিরন্তন অতৃপ্ত পিপাসা। রবীন্দ্রনাথের খণ্ড-উপন্যাসগুলিতে এই বেদনা অনুভব করা যায়।

কিন্তু মহৎ ব্যর্থতা কোনো সান্ত্বনার বাণীই বহন ক'রে আনে না। বঙ্কিমচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত কামনার সর্বনাশ সূচিত ক'রে ও জীবনের অসাফল্যের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর কল্যাণ-অভিমুখী প্রেরণায় প্রবুদ্ধ ক'রে দুঃখ-নিবৃত্তির সন্ধান দিয়েছেন। উত্তাল উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়কে শান্ত করে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী। নগেন্দ্র লজ্জিত অনুতপ্ত হ'য়ে ফিরে আসে সূর্যমুখীর কাছে, প্রতাপ অমরধামের উদ্দেশে যাত্রা করে, গোবিন্দলাল প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে থাকে— 'আমি ভ্রমরাধিক ভ্রমর পাইয়াছি।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে লৌকিক জীবনে কাম এবং প্রেমের উৎস যখন একই তখন এই প্রেমও দেহধর্মের নামান্তর মাত্র। প্রেম মূলত অনিবার্য জীবপ্রবৃত্তি

থেকেই হয়তো জেগেছে, কিন্তু আবেগ-বেদনা এবং আদর্শের অনুরঞ্জনে মানুষ এই প্রেমকেই তার মনুষ্যত্বের নিদান ক'রে তুলেছে। দেহই আত্মার আধার, দেহধারী মানুষেই প্রেম সম্ভব —সেই অর্থে যদি বলি দেহজ ধর্ম, তবু তাকে মূঢ় প্রবৃত্তি বলতে পারিনে। প্রেম দেহধর্ম-সম্পর্কিত হ'লেও তার চরমোৎকর্ষ আত্মিক মিলনে। প্রধানত প্রেমকে এই মানসোৎকর্ষের দিক দিয়েই দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। কিন্তু বঙ্কিম-প্রেম-সাহিত্যে আছে মূঢ় অসহায়তা-সর্বস্বতা। এই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বঙ্কিম ও পরবর্তী রবীন্দ্র-শরৎসাহিত্যে প্রেমের রূপে ও উপলব্ধিতে বৈষম্য দেখা দিয়েছে। শুধু একটি বিশেষ সাদৃশ্য হ'ল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেই মনে করেছেন ভালোবাসাই নারীর প্রধান ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবীচৌধুরানী" "আনন্দমঠ" "সীতারাম", রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" এবং শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" তার প্রমাণ। সর্বত্রই প্রতিকূল পরিবেশে নারীর চিরন্তন রূপটি আরও বেশি ক'রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্র ও শরৎ -সাহিত্যে প্রেম পরমুখী। বঙ্কিমসাহিত্যে বিবাহিত স্ত্রীর প্রেমকেই কেবল পরমুখী বলা হয়েছে এবং বিবাহবন্ধননিরপেক্ষ প্রেমিকার প্রেম আত্মমুখী। নারীমনের দ্বৈধ বঙ্কিম শ্রদ্ধা করতে পারেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ-সত্ত্বেও কবি-বঙ্কিমের মমতা থেকে শেষ পর্যন্ত কুন্দনন্দিনী বঞ্চিত হয় নি। নগেন্দ্র অবিবাহিত হ'লে কুন্দের সঙ্গে মিলনের সুফল হ'ত কি না কে বলতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেম-সম্পর্কে যে-আদর্শবাদ ছিল সে-বিষয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন "বিবিধ প্রবন্ধ", 'অনুশীলন' প্রভৃতি রচনায়। এগুলিতেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত হয়েছে ব'লে ধ'রে নিতে বাধা নেই। কুন্দ, সূর্যমুখী, কমলমণি— "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসেই এই তিনটি সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে নারীপ্রেমের

তিনটি রূপ এঁকেছেন বঙ্কিম। দাম্পত্য গার্হস্থ্য প্রেমের নির্দ্বন্দ্ব রূপ চিত্রিত হয়েছে কমলমণিতে। দাম্পত্য প্রেমের জটিলতায় অধিকারস্পৃহা, ভালোবাসা ও অভিমান এবং পরিশেষে ক্ষমায় অবসান— এরই বিচিত্র দ্বন্দ্ব-বেদনা সূর্যমুখী-চরিত্রে পরিস্ফুট। কুন্দনন্দিনীর মন কুসুমসুকুমার। বঙ্কিমসাহিত্যে কুমার-কুমারীর প্রেমেরও মিলন হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে। প্রেমে দুঃখের দুশ্চর তপস্যা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ -প্রেম-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। দুঃখের অগ্নিদাহন ও বিচ্ছেদের অপরিসীম বেদনায় মানুষের যে-মূর্তি পরিস্ফুট, তার মধ্যেই দীপ্যমান ভালোবাসার অমিত ঐশ্বর্য।

প্রেম-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতও বঙ্কিমের ন্যায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে বহুবিধ প্রবন্ধে। শরৎচন্দ্রেরও নানা প্রবন্ধে তাঁর প্রেমাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের প্রেম-আদর্শের প্রতিফলন হয়েছে কেবলমাত্র কথাসাহিত্যে, আর রবীন্দ্রপ্রেমের বস্তুরূপ শুধুমাত্র কথাসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় নি, আদর্শনির্গলিত সে-ভাবের রূপায়ণ হয়েছে তাঁর কাব্যেও।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম কখনো-কখনো আত্ম-নিদিধ্যাসনে ও চেতন-প্রজাত-সত্তায় পর্যবসিত হয়েছে। বাস্তব বৈষম্যের সেখানে সমন্বয় হয়েছে ভাবে-মননে। শরৎচন্দ্রও প্রেমকে মানসিক ব্যাপার ব'লেই মনে করেছেন। হৃদয়াবেগ ও মননের সমন্বয়ে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের অভিনবত্ব। শরৎসাহিত্যে মনস্বিতা থাকলেও আবেগেরই প্রাধান্য। পুরুষ এবং নারীর প্রেমের পূর্ণতার দিকটি শরৎচন্দ্র দেখেছেন ব্যক্তিবিশেষের দিক দিয়ে। রবীন্দ্র-প্রেমকাব্যে মহাজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই খণ্ড আবেগের সত্য নিরীক্ষা। রবীন্দ্র-মানসের স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই বিশেষ নরনারীর মধ্যে প্রেমের উদ্বোধন বিকাশ এবং পরিণতি ঘটলেও সে-প্রেম সহজেই নির্বিশেষ

রস-ব্যঞ্জনায় বিশ্বব্যাপী মূর্তি লাভ করে। এক নন্দিনীতে রবীন্দ্রনাথ পুরুষসমাজের শ্রীহীনতাকে পূর্ণতা দিতে নারীপ্রেমের সামগ্রিক মর্যাদা ও প্রাণবান প্রেরণার অবতারণা করেছেন। শরৎ-প্রেম-সাহিত্যে তা নয়, সেখানে ব্যক্তির আবেগের মধ্যেই জীবনকে দেখা হয়েছে। এইজন্যই রবীন্দ্রপ্রেমে যেখানে বহিরঙ্গপ্রকাশে তীব্রতা মন্দীভূত হ'য়ে আসে, শরৎসাহিত্যে বিশেষ প্রেম সেখানে বিশিষ্ট রূপেই দেখা দেয় এবং রবীন্দ্র-আদর্শের অনুগামী হ'য়েও তার তীব্রতা অনেক বেশি।

শরৎসাহিত্যেও প্রেম স্বভাবধর্মরূপে স্বীকৃত। শরৎসাহিত্যে হৃদয়নীতির সমাজপ্রতিষ্ঠা পাবার প্রধান বাধা নারীমনেরই আজন্মলালিত সংস্কার। স্ত্রীত্ব মাতৃত্ব ছাড়াও নারীর যে স্বাধীন মানবিক সত্তা আছে, প্রেমের ক্ষেত্রে তা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং পরবর্তী শরৎসাহিত্যে।

একটি বিশেষ যুগের বাঙালীহৃদয়ের বেদনাকে মূর্তি দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। চিরাভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বে কখনো নারী সংস্কারকে অতিক্রম করেছে, কখনো তা পারে নি। হৃদয়ের এই দুটি শক্তির সামঞ্জস্যবিধানেই তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। নারীজীবনের এই বেদনাই শরৎ-প্রেমসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। পুরুষের চেয়ে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেয়েছে শরৎসাহিত্যে— শরৎসাহিত্যে শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেই। রবীন্দ্রসাহিত্যে বঙ্কিমসাহিত্যের মতো পুরুষের অসহায়তা নয়, পৌরুষের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে, মানুষের স্খলন পতন ত্রুটি তিনি সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সমাজ-অনুশাসনে ব্যক্তি-সত্তার বিড়ম্বনা, মনুষ্যত্বের নির্যাতন তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর সমকালীন বঙ্গসমাজ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্ব-

বেদনাকেই তিনি মূর্তি দিয়েছেন। সমাজবিদ্রোহ ঘটিয়ে কোনো সুস্পষ্ট সমাধানের পথনির্দেশ না করলেও তাঁর নামের সঙ্গে যে-বিদ্রোহের কথা জড়িয়ে আছে তা আংশিকভাবে সত্য। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও প্রেমকে স্বভাবধর্ম-রূপে গ্রহণ ক'রে মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়াকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করেছিলেন। এমনকি পতিতা নারীর প্রেমও তাঁর শ্রদ্ধা পেয়েছিল। তাই সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ তাঁর সাহিত্যকে ধ্বংসাত্মক ব'লে মনে করেছিল। সমাজের নেপথ্যে রয়েছে যে-নারী, তারও অন্তরের অন্তস্তলে শরৎচন্দ্রের দরদী হৃদয়ের দৃষ্টি পৌঁছেছে। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী সাধারণ কিন্তু মহীয়সী। সামান্য ত্রুটিতে, কখনো বা ভাগ্যবিপর্যয়ে সমাজ-পরিত্যক্ত হ'লেও মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি এদের। যে-প্রেমে সততা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস অটুট সেখানেই শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা, তা হোক সমাজবিধিগত বা সমাজ-বিধিবহির্ভূত। অপচয়ের ক্ষতি শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু সমাজের প্রতি মমতাটুকুও তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। এই বেদনা ও দ্বন্দ্বেই প্রেমের রসরূপ উন্মোচিত হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মসৃণ মিলনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

শরৎসাহিত্যে এক অভয়া ও কমল ছাড়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি কেউ, সামাজিক বাধা ও সংস্কার অন্তরের দিক থেকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি যদি বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হ'য়েও থাকে। যে-রাজলক্ষ্মীর মহত্ত্ব ব্যক্তিত্ব প্রেম শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করেছিল তাকেও বধূবেশে দেখা গেল না। মিলনাকাঙ্ক্ষা ও বিচ্ছেদকাতরতার টানাপোড়েনে রাজলক্ষ্মীর শিল্পমূর্তিই শুধু উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। শরৎসাহিত্যেও প্রেম তপস্যার ধ্যানময় কল্পনার রসে সিঞ্চিত। সর্বস্বত্যাগিনী রাজলক্ষ্মীই শ্রীকান্তের একান্ত নির্ভর কিন্তু সেই শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্ভ্রমবোধ, মর্যাদাবোধের দ্বন্দ্বে

ট্র্যাজেডি হয়েছে ঘনীভূত। স্বাভাবিক সংযম যেমন তাদের রক্ষা করেছে, ভেসে যেতে দেয় নি, তেমনি সংস্কার ও সম্ভ্রমবোধ রাজলক্ষ্মীকে দাম্পত্য প্রেমের মসৃণ পথে এগিয়ে যেতেও বাধা দিয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে হৃদয়নীতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ ও স্বীকৃতি এবং শরৎসাহিত্যে উচ্চনীচ ব্যক্তি নির্বিশেষে এই নীতির প্রাধান্য সত্ত্বেও তাঁদের সাহিত্যে সৃষ্ট নরনারীর মানসিক বেদনা বা মোহ-আকাঙ্ক্ষা এক সর্বংসহ, অপ্রগল্‌ভ রূপ নিয়েছে। প্রায় সকলেরই প্রেম-উপলব্ধির মহিমায় একটি আত্মসমাহিত শক্তি স্থায়ী সৌন্দর্যরূপ লাভ করেছে আন্তরব্যঞ্জনায়। প্রেমের বিন্যাসে একদিকে চারুতা, কমনীয়তা, আর-একদিকে সংযম এই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের প্রতিফলনে নানা লীলার বৈচিত্র্যে বৃত্ত সম্পূর্ণ হ'তে দেখেছি কিন্তু তার কেন্দ্র একটি এবং তা আদর্শে বিধৃত। শরৎসাহিত্যপ্রসঙ্গেও আমরা ঐ মর্মবিন্দুটি খুঁজে পেয়েছি, সে-মর্মটি হচ্ছে প্রেমের মানসোৎকর্ষসাধনা।

রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ঊর্ধ্ব মনোলোক সৃজিত হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে সেই মানস-উৎকর্ষ সাধারণের মধ্যে নেমে এসেছে, ফলে আজকের বাঙালীর সমাজমানস অনেকখানি পরিবর্তিত; অনেকখানি পরিশীলিত মনোভাব, ঔদার্য ও সহনশীলতা দেখা দিয়েছে আজ বাংলা সমাজে।

৬ ॥ রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রেমসাহিত্যের সূচনা

. . . .

রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে ছিল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলালের প্রস্তুতি। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলাসাহিত্য সর্বতোভাবে সর্বমুখী উদার প্রেরণা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের প্রভাবের কথা এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, "চোখের বালি" উপন্যাস এবং 'ল্যাবরেটরি' গল্প বাংলা প্রেমসাহিত্যের মোহমুক্তি, সংস্কারমুক্তি ঘটিয়েছে। আর "পূরবী", "মহুয়া", "শেষের কবিতা"য় প্রেম যে ব্যঞ্জনাময় উদার মনস্বিতার পথনির্দেশ করেছে, অতি-আধুনিক বাংলা প্রেম-সাহিত্যের আদর্শ তা কি অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছে ?

শুধু শক্তি-অশক্তির দ্বন্দ্বে ভাস্বর নয়—মানুষের শুভবুদ্ধি, সামাজিক শিববুদ্ধি এবং সুষম সৌন্দর্যবোধের উচ্চতর মনোলোক সৃজিত হয়েছে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যে। বিহ্বল মুহূর্তে মানুষ দুঃখকে বরণ করলেও তা থেকে উত্তীর্ণ হবার বাসনাও তার আছে। এই মহৎ উৎস থেকে মানুষের শিববুদ্ধি জাগ্রত হয়, দুঃখের আগুনে পুড়ে তার কাম-সংস্কারমুক্ত মনে জাগে পরিশুদ্ধ চেতনা—এবং এই চেতনাই তার উত্তাল হৃদয়াবেগকে শান্ত

করে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মহৎ কল্যাণকে সুগম করে। মানুষের এই পরিচয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য ভাস্বর।

'ভারতী' ও 'কল্লোল' -গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ-কথা উল্লেখযোগ্য যে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর উপর "চোখের বালি"র প্রভাব ছিল প্রবল। শরৎসাহিত্যের মূল প্রেরণাও "চোখের বালি"। প্রেমে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রচলিত সংস্কারকে আহত করলেও সেই স্বাধীন প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ অশ্রদ্ধা করেন নি, বোধ ও বুদ্ধির কাছে তার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রও শাস্ত্র-বিধিসম্মত নীতিবোধের বাইরে হৃদয়নীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জানিনে জনমে সতীর প্রথা
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র এই উপলব্ধিরই বিস্তারিত বিশ্লেষণ শরৎসাহিত্যে সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের অভিমতও এই :

সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?[১]

তিনি আরও বলেছেন—

সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার জ্ঞান করি।[২]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও হৃদয়াবেগের উপর শাস্ত্রানুশাসনের ও সমাজ-

১ স্বদেশ ও সাহিত্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ ঐ

বিধির কঠিন পাশ এবং এ দুয়ে মিলে বাঙালীজীবনে যে-দ্বন্দ্ব যে-চিত্তমন্থনের পালা শুরু হয়েছিল তারই একটি সমস্যাসংকুল, মর্মভেদী অথচ জীবনরসপিপাসাব্যাকুল মনোহর রূপ আত্ম-প্রকাশ করেছে শরৎসাহিত্যে। অন্তরের সুকুমার ভাবপ্রবণতা, ভালোবাসার মৌনমধুর অপ্রগল্‌ভ রূপই শরৎসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, এবং এরও প্রেরণা রবীন্দ্রসাহিত্য। যদি বা কখনো অবগুণ্ঠিত প্রবৃত্তি উন্মত্ত হাহাকারে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে তাও খানখান হ'য়ে ভেঙে পড়েছে ট্র্যাজেডির করুণ মূর্ছনায়। শরৎ-সাহিত্যে প্রেম স্বচ্ছন্দ বিকাশের অভিনন্দন পেয়েছে ; বহিঃ-প্রকাশ তার সমাজে নয়— অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো।

'ভারতী'-গোষ্ঠীর পরে 'কল্লোল'-দলের লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্র-ব্যূহ ভেদ ক'রে নতুন কিছু সৃষ্টি করবার অদম্য চেষ্টা দেখা গেল। বিশেষ ক'রে নগরজীবনের অবক্ষয়ের বাস্তব দিকটি ফুটিয়ে তুলবার প্রবল ঝোঁক দেখা গেল তৎকালীন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের মধ্যে। যে-বাস্তবের কঙ্কাল উদ্‌ঘাটিত হয় নি, যে-জীবনের তীব্র জ্বালাযন্ত্রণার পীড়িত চিহ্ন নেই বাংলাসাহিত্যে, সেই দিকটিতেই তাঁরা নজর দিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহে আবিলতা দেখা দিয়েছিল। প্রেমের স্বচ্ছন্দ বিকাশ স্বেচ্ছাচারের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। নবীন শক্তিমান লেখকগণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মারফতে ভোগ ও বুদ্ধিবাদের আতিশয্য-মুক্ত সহজ মনোভঙ্গি দান করতে পারেন নি। সম্ভবত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাতে বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল এবং তাতেই প্রেমের ক্ষেত্রে ধ্যানময় সৌন্দর্যলোক, ত্যাগ-তিতিক্ষার নিগূঢ় মাধুর্য সৃষ্টি অপেক্ষা মনোলোকবীক্ষার স্পৃহাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে রবীন্দ্র-শরৎ-পরবর্তী 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রেমসাহিত্যে। উপন্যাস, ছোটোগল্প, এক কথায়

জীবন ও সমাজের সঙ্গে কথাসাহিত্যের খুব নিবিড় সম্পর্ক। আর মানুষই যখন সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য তখন তার অবচেতন মনের গতি ও প্রকৃতির স্বীকৃতি থাকবেই তাতে। কিন্তু শুধুমাত্র স্থূলত্বই যদি নিরঙ্কুশ হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সাহিত্যের সুর নেমে যায়। সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তখনই সার্থক যখন তা পূর্ণাঙ্গ জীবনধর্মের উপর সংস্থিত। কেবলমাত্র ভোগতান্ত্রিক অস্থিরচিত্ততাপ্রিয়তায়, জীবনের বহিরঙ্গ সাধনায় ও তার বল্গাহীন প্রবলতায় প্রেমের আত্মিক আদর্শ বজায় থাকে কি?

নগরজীবনের পারিপার্শ্বিকতায় মধ্যবিত্ত নরনারীর অবরুদ্ধ যৌনবৃত্তির অকপট প্রকাশবাহুল্যে ও সমাজজীবন-সমস্যার আতিশয্যে বিচলিত ও বিভ্রান্ত মনের অবসাদ প্রকট হ'য়ে উঠেছিল এই যুগের বাংলা প্রেমসাহিত্যে। অবশ্য এই আলোড়ন পরে আবার থিতিয়ে গিয়েছে। সহজ জীবনকে ফিরে পাবার উৎকণ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে বাঙালী চিত্তে। কোনো একটি বিশেষ যুগে সাহিত্যে বিশেষ চিন্তা বা পন্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পুনঃপুনঃ অনুশীলন চলতে থাকলে এমন একটা অবস্থা আসে যখন মানুষ অন্য কিছু পেতে চায় এবং তখনই সাহিত্যে মোড় ঘুরে যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গতি-পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও দেখি বৈষ্ণবকাব্যের উত্তুঙ্গ ভাবতন্ময়তা থাকা সত্ত্বেও তারই পাশে অবহেলিত সাধারণ সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে সহজ গ্রামীণ লোকজীবনের গাথা। এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যের তূষ্ণীম্ভাবের ব্যূহ ভেদ ক'রে এক তীব্র জিজ্ঞাসা জাগল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সাহিত্যসৃষ্টিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রেরণা তাঁদের মনে নিশ্চয় ছিল কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন নতুন কিছু সৃষ্টি করতে, নতুন পথের

নিশানা দিতে। আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আধুনিক বাঙালীর জীবনবোধকে ব্যাপক ও জীবনের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে নিঃসন্দেহে। তাই বাংলা প্রেমসাহিত্যেও এই বিচিত্র সম্ভারের সংমিশ্রণে স্বাদে গন্ধে বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আজকের মানুষের মন এমন অবস্থায় এসে উত্তীর্ণ হয়েছে যখন আর 'এটা আদর্শ' 'এটা নীতিবিরুদ্ধ' ব'লে চালনা করা যায় না তাকে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে ভোগতান্ত্রিকতা নিরঙ্কুশ হ'লে সাহিত্যের সুর নেমে যায়। 'কল্লোল'-এর সাহিত্যসৃষ্টিতেও তাই হয়েছিল। তরুণ সাহিত্যিকদের সেই দৃষ্টিবিভ্রম রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিয়েছিল। আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম রবীন্দ্রনাথ তখন সৃষ্টি করলেন "শেষের কবিতা"। বাংলা প্রেমসাহিত্যের মোড় ঘুরে গেল। সংস্কারমুক্ত প্রেমের অপরিসীম ঔদার্য, সংযম সম্ভ্রম ও শুচিতার আদর্শ নিয়ে এল "শেষের কবিতা"। সূক্ষ্ম বেদনার রসব্যঞ্জনা বাংলা প্রেমসাহিত্যে নতুন রসের প্রণোদনা দিয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জানবার আমাদের আরও বাকি ছিল। রবীন্দ্রপ্রেমের দৃষ্টি ও সৃষ্টিতে সহজের সুর পেয়েছি, কামসংস্কার-মুক্ত মহৎ চেতনার ব্যঞ্জনা পেয়েছি; আবার পেলাম মানুষের শাশ্বত কামনার তীব্র অনিবার্য রূপ তাঁর সায়াহ্নের প্রেম-কাহিনীগুলিতে। "দুই বোন", "বাঁশরী", "মালঞ্চ", "চার অধ্যায়" প্রভৃতি প্রেমকাহিনীগুলি কামনাদীপ্ত অপ্রত্যাশিত অন্তর্জ্বালার স্বাক্ষরবাহী। রবীন্দ্রপ্রেম-দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে প্রথম দিকের বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা প্রভৃতি এবং শেষের দিকে উর্মিমালা, শশাঙ্ক, আদিত্য, বাঁশরী, এলা, শ্যামা প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে বুঝতে হবে ভালো ক'রে। কিন্তু এর পরেও বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে ছিল। সে-বিস্ময়— সোহিনী। সোহিনী-চরিত্র বীজের মতো কাজ করেছে। বাংলাসাহিত্যে অনেক

মানসী নায়িকা জন্ম নিয়েছে এর মধ্য থেকে— সোহিনীর পূর্ব-ইতিহাসটুকু বাদ দিয়ে যদি ধরি। আধুনিক জটিল জীবনযাত্রার যুগে বিচিত্র ভাবগ্রন্থিবহুল বিবাহ-নিরপেক্ষ পুরুষ-নারীর যে সংবেদনশীল মনোভাব, পরস্পরের প্রতি যে-আকর্ষণ, তাকে প্রেমেরই রূপান্তর বলা যেতে পারে। তা দাম্পত্য প্রেম নয়; সামাজিকভাবে নিঃসম্পৃক্ত সে-প্রেম— এমনকি নিবিড় বাহু-বন্ধনে ধরা দেবার আকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় সেখানে মুখ্য নয়। এ-প্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এই সম্পর্ককে হয়তো সখ্য-প্রেম ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। যে-নারী ব্যক্তিত্বে, বৈদগ্ধে, রসবৈভবে, জীবনের অভিজ্ঞতায় সর্বাংশে সমকক্ষ— সেই মাধুর্যরসাভিষিক্ত 'মনের দোসর', জাগানিয়া বন্ধু, প্রচলিত অর্থে প্রেয়সী নয়— 'লীলার সহায় লাগি' তার 'বহুত প্রকাশ'। সে-নারী উত্তমা, প্রিয়া, সে 'সখি'। আধুনিক যুগ-পরিবেশে 'ভাবৈকরস'সমৃদ্ধ সেই শ্রেয়সীর জন্ম; আধ্যাত্মিক-আবরণ-বিমোচিত সে, রসাশ্রিত, কিন্তু নয় রসবিগলিত। সে 'গুরু' বা 'শিষ্যা' না-ও হ'তে পারে— 'বান্ধব' নিশ্চয়ই। কিন্তু সে 'লীলার সহায়' ব'লেই 'দাসী' নয়।[১] তার স্বাতন্ত্র্যেই সে মহিমাময়ী, মহীয়সী। রবীন্দ্র-প্রেমসাহিত্যেই আমরা তার দেখা পেয়েছি। তার প্রভাব আধুনিক বাংলা প্রেমসাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত।

১ বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।
কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী,
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখি, দাসী।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ধকার স্তরভূমি পার হ'য়ে সত্তার ধ্রুবভূমিতে উত্তরণই রবীন্দ্রপ্রেমচর্চার প্রকৃত স্বরূপ। এই আদর্শ, নারীর অন্তর্গূঢ় ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্বের সম্মান, প্রবুদ্ধ আত্মচেতনা ও শ্রেয়োবোধ, রবীন্দ্রসাহিত্যের এই পরম ফলশ্রুতিই শরৎচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানবিক মহিমার অনুপম গৌরব অথবা সম্ভোগসংরক্ত আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত চেতনা— এ দুটির যেটির জন্যই হোক, সেই চিরকালীন হৃদয়ধর্মের আনন্দভাণ্ডারীর কাছে হাত পাততে হবে বাংলাসাহিত্যের অনাগত সাহিত্যিককেও।

গ্রন্থপঞ্জী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	৺দীনেশচন্দ্র সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১, ২, ৩ খণ্ড	শ্রীসুকুমার সেন
বৈষ্ণব রসসাহিত্য	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— দর্শনে ও সাহিত্যে	শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত
বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ	„ „
মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
বাঙ্গালার লোকসাহিত্য	„ „
আধুনিক বাঙলা সাহিত্য	৺মোহিতলাল মজুমদার
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস	„ „
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র	„ „
রবীন্দ্রনাথ	৺অজিতকুমার চক্রবর্তী
কাব্য পরিক্রমা	„ „
রবীন্দ্রসাহিত্য পরিচয়	শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন
রবীন্দ্রনাথ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য	শ্রীবুদ্ধদেব বসু
An Acre of Green Grass	„ „

সাহিত্যচর্চা	শ্রীবুদ্ধদেব বসু
তীর্থঙ্কর	শ্রীদিলীপকুমার রায়
রবীন্দ্রজীবনী ১, ২, ৩ খণ্ড	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
জয়ন্তী উৎসর্গ	রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা কর্তৃক সম্পাদিত
রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ১, ২ খণ্ড	শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ১, ২ খণ্ড	” ”
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ ১, ২ খণ্ড	” ”
বাঙলা সাহিত্যের নরনারী	” ”
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	” ”
রবীন্দ্র বিচিত্রা	” ”
বাঙলা সাহিত্যের রূপ ও রেখা	শ্রীগোপাল হালদার
মানবধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ	শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার
বঙ্কিম মানস	” ”
রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়	শ্রীক্ষুদিরাম দাস